রূপায়ণ

সমরেশ বসু

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

স্বর্গত ডকটর দেবনাথ রায়ের উদ্দেশে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিষের স্বাদ

অলকা সংবাদ

অলিন্দ

অচিনপুর

অপরিচিত

অগ্নিবিন্দু

ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। এ ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দ, তীব্র তীক্ষ্ণ একটানা ক্রিং ক্রিং শব্দ না। অনেকটা জলতরঙ্গের বাজনার মত। যেন কেউ পিয়ানোর বুকে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে, নিচু সুরে দ্রুত একটি তরঙ্গ তুলল। নামকরা মেকারের বিশেষ ভাবে তৈরী করা টাইমপিস। এ শব্দ চমকে জাগিয়ে তোলে না। বিরক্তি উৎপাদন করে না। অনেকক্ষণ ধরে বাজলেও শুনতে খারাপ লাগে না। বাড়িসুদ্ধ লোকের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয় না।

অ্যালার্মের জলতরঙ্গের সুরঝংকার মুহূর্তের বিরতি দিয়ে দিয়ে প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড বাজল। নীরার চোখের পাতা কাঁপল। ওঁর ঘুম ভেঙেছে। ভেঙেছে, কিন্তু যেন ভাঙেনি, এমনি একটা তন্দ্রালু ভাব। নীরা একবার চোখ মেলে তাকাল। আবার বুঁজল। অ্যালার্মের সুর-তরঙ্গের ধ্বনি শুনল। ওর খাটের ধারেই, আখরোট কাঠের কাশ্মীরি টি-পয়ের ওপরে টাইমপিসটি বসানো। কারুকার্য করা কাঠের ফ্রেমে তিন দিক মোড়া রুপোলী টাইমপিস। নীরা ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে, বোতাম টিপে, শব্দটা বন্ধ করতে পারে। কিন্তু করল না। প্রায় আধ মিনিট ধরে বেজে একেবারে থেমে গেল।

নীরা তথাপি চুপ করে শুয়ে রইল। ও জানে, এ শব্দ অন্য কোন ঘরে পৌঁছয়নি, অতএব এখনো কেউ জাগেনি। এমন কি কণাও না। নীরার ঘুম ভাঙলেই যে প্রথমে ওর ঘরে আসে চা নিয়ে। বলতে গেলে কণাই নীরার ঘুম ভাঙায়। রোজ সকাল সাতটায় কণা চা নিয়ে ঢোকে।

কোন দিনই প্রায় ডেকে নীরার ঘুম ভাঙাতে হয় না। সাতটার সময় এমনিতেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের একটা আলস্য জড়িয়ে থাকে। কণা চা নিয়ে ঢুকলেই সে আলস্যটুকু কেটে যায়। নীরা উঠে বসে। কণার মুখের দিকে তাকায়। কণাও নীরার মুখের দিকে তাকায়। একটু হেসে, টি-পয়ের ওপর ট্রে রেখে, নেটের মশারিটা তুলতে যায়। নীরা তার আগেই উঠে বসে। খোলা চুলের গোছা পিছনে ঠেলে দেয়। গায়ের ঢাকনাটা সাবধানে সরিয়ে, স্লিপিং গাউনটা পা অবধি টেনে দেয়। নিজের হাতে মশারি সরিয়ে খাটের ধারেই বসে। কণা জিজ্ঞেস করে, চা ঢালব বড়দি?

নীরা বলে, ঢালো।

ঘুম থেকে উঠে কণার মুখ দেখতে নীরার খারাপ লাগে না। কালোর ওপরে বেশ সুশ্রী সুন্দর মুখখানি। সারা শরীরে এবং মুখে একটি স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। ডাগর চোখ দুটি গভীর কালো। মুখের হাসিটি মিষ্টি আর সরল। নীরার দিকে তাকিয়ে হাসবার সময় স্বভাবতই একটি সম্ভ্রমের ছোঁয়া লেগে থাকে। বয়স কুড়ি বাইশের বেশি নয়।

কণাকে কোনরকমেই দাসীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। নীরা তাকে কোনদিন সে চোখে দেখেওনি। কণা ভদ্র পরিবারের অল্পশিক্ষিতা মেয়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে উঠেছিল এক গরিব আত্মীয়ের বাড়িতে। বাবা মা ভাই বোনেরা এখনো সবাই পূর্ববঙ্গেই রয়ে গিয়েছে। বাবার অবস্থাও ভাল নয়। কিন্তু কেবল সেইজন্যই কণাকে কলকাতায় পাঠানো হয়নি। ডাগর হয়ে ওঠা মেয়েকে বাবা মা সেখানে রাখতে সাহস পায়নি। তা ছাড়া, কলকাতায় গেলে, কণা হয়তো কিছু পড়ে শিখে রোজগারও করতে পারে। তার বাবার মনে সে রকম আশাও ছিল। আশা একেবারে বিফলে যায়নি। কণা এখন নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করছে।

কণার সেই গরিব আত্মীয়টি নীরার বাবার ফার্মে অল্প মাইনের

চাকরি করে। তার ডিপার্টমেন্টের হেড ক্লার্ককে ধরে নীরার বাবার কাছে আর্জি করেছিল, মেয়েটির কোন গতি করা যায় কী না। বাবা এক কথায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওসব মেয়েদের বিষয়, তাঁর কন্যা নীরাই একমাত্র বলতে পারে। মেয়েটিকে নিয়ে তার আত্মীয় যেন নীরার সঙ্গে দেখা করে। বাবা মুখ ফুটে কারোকে ফেরাতে পারেন না। তার ফলে নীরা যে কত অসুবিধেয় পড়ে, বাবার সে কথা মনে থাকে না। তাঁর ধারণা, নীরা যা করবে, সেটাই ঠিক।

কণার সেই আত্মীয়টি তাকে নিয়ে এসেছিল। কণাকে দেখে নীরার ভাল লেগেছিল। কথাবার্তাও পছন্দ হয়েছিল। মনে মনে খুশি হয়েছিল মেয়েটির আত্মসম্মানবোধ দেখে। কণাকে ও বাড়িতে রেখেছিল। প্রথমে কিছুই স্থির করতে পারেনি, কণাকে কী কাজ দেবে। বাড়ির আর পাঁচটি সাধারণ ঝিয়ের কাজ করতে দিতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পেরেছিল, মেয়েটির অনেক গুণ। মোটা-মুটি লেখাপড়া জানে। বাঙলা হাতের লেখাটি চমৎকার। কিছু কিছু সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ জানে। নিতান্ত গান শুনে, নভেল পড়ে খুশি থাকা আর দশটা মেয়ের মত না। অকারণ কোন উচ্ছ্বাস নেই। অথচ হাসিখুশি বুদ্ধিমতী। নীরা লক্ষ্য করেছিল, কণার দৃষ্টি সজাগ। বিশেষ করে নীরার প্রতি। নীরার প্রতিটি কাজের দিকে কণার লক্ষ্য। কখন নীরার কী প্রয়োজন, কণা আপনা থেকেই বুঝতে পারত। দেখে শুনে নীরা কণাকে ওর নিজের ব্যক্তিগত কাজেই লাগিয়েছিল। মনে মনে কণার প্রতি একটি স্নেহ অনুভব করেছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে কণার সঙ্গেই নীরার চোখাচোখি হয়। একটু হাসি বিনিময়ও হয়।

আজ এই ভোরে, এখন কণা আসবে না। নীরা চোখ বুজেও জানে, এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। ও নিজের হাতেই ঘড়িতে দম দিয়ে

রেখেছিল গতকাল রাত্রে। কণাকে সেকথা জানায়নি। জানাতে ইচ্ছা করেনি। আজ ভোরের এক দেড় ঘণ্টা ও একলা থাকতে চায়। একলা, জেগে জেগে, স্মৃতিচারণ করতে চায়।

নীরা চোখ খুলল। সুখনিদ্রা থেকে জেগে ওঠার কোন তৃপ্তির ছাপ নেই ওর মুখে। ওর দৃষ্টি অন্যমনস্ক। মুখে ব্যথার ছায়া। ওর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আবার চোখ বুজল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপল। বুকের কাছে টনটনিয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হল। তারপর ওর চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল। ও আরো জোরে ঠোঁটে ঠোঁট টিপল। কিন্তু উদ্গত কান্নাকে কোন রকমেই যেন রোধ করতে পারল না। ওর মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল। কান্নার আবেগে সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজল। কান্নার বেগ কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। শরীর কাঁপতে লাগল। ঘাড়ের ওপর, বালিশের ওপর চুল ছড়িয়ে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছে, এই কান্নার কাছে ও অসহায়। বালিশে মুখ চেপে কান্নার মধ্যেই দু'বার ডেকে উঠল, মীরা···মীরা···

কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কান্নার বেগ থামল। নীরার শরীর স্থির হল। ওর চোখের সামনে মীরার চেহারাটা জেগে উঠল। না, মীরার সেই টানা চোখে ঝিলিক হানা হাসি, অপরূপ সুন্দর মুখের সেই ছেলেমানুষি চটুল ভাব, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রায়-উদ্ধত যৌবন ভরা শরীর, চঞ্চল হরিণের মত ছুটে বেড়ানো সেই চেহারাটি না।

নীরার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই চেহারা। মীরার ফর্সা সুন্দর মুখে যেন কেউ গাঢ় করে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। গাঢ়তর কালি তার চোখের কোলে। যেন গভীর পরিখার মধ্যে ঢোকানো দুটি আলোহীন অন্ধকার ভয়ার্ত চোখ। সারা মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আর ভয়ের অভিব্যক্তি। ঠোঁট দুটি একেবারে নীল। ঠোঁটের কষে ফেনা। চুল আলুথালু। আঁচল মাটিতে লোটানো। কোমরের কাছ থেকে

শাড়ির বন্ধনী প্রায় খুলে পড়েছে, শায়ার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। বুকের জামার বোতাম পর্যন্ত লাগানো ছিল না।

নীরার চোখের সামনে, মীরার সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস—হ্যাঁ বীভৎস, আর্ত চেহারাটাই ভেসে উঠছে। মীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ভেজানো দরজার ওপরে। তখনো যেন ভাল করে ভোর হয়নি। হেমন্ত গিয়ে নতুন শীত পড়তে আরম্ভ করেছিল। রাত্রি বড় হয়েছিল, ভোর হতে দেরি। তখন সাড়ে পাঁচটা বেজেছিল। আজকের এই সময়। কিন্তু এখন শীতের সময় না, তাই কিছুটা আলো ফুটে উঠেছে। তিন বছর আগে, এক নতুন শীতের ভোরে, তখনো অন্ধকার। নীরার ঘরে একটি জিরো পাওয়ারের নীলাভ আলো জ্বলছিল। ও তখন গভীর ঘুমে মগ্ন।

সহসা দরজায় জোরে শব্দ হতেই নীরার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু বুঝে ওঠবার আগেই মীরা এসে মশারিসুদ্ধ ওর বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর্ত-তীক্ষ্ণ কিন্তু নিচু স্বরে ডেকে উঠেছিল, দিদি, দিদি!

নীরা ঝটিতি উঠে বসেছিল। একটা দিশেহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়েছিল। পরমুহূর্তেই জোর করে টেনে মশারি সরিয়ে দিয়েছিল। মীরা তখন ওর কোলের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। জিরো পাওয়ারের নীলাভ আলোয় স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পায়নি। কেবল কোলের কাছে লুটিয়ে পড়া মীরার আলুথালু চেহারাটাই দেখতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কী হয়েছে মীরা? মীরা! এমন করছিস কেন?

মীরা যেন দলা পাকানোর মত করে, নীরার কোলের কাছে আরো নিবিড় হয়ে এসেছিল। রুদ্ধ আর্ত নিচু স্বরে বলেছিল, সব জ্বলে যাচ্ছে দিদি, বুকের মধ্যে পুড়ে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।

নীরার বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠেছিল। একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহে ও তীব্র আর্তনাদ করে উঠেছিল, কী হয়েছে মীরা! কী করেছিস তুই?

মীরা সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারছিল না। ওর গোটা শরীরটা পাকিয়ে দুমড়ে যাচ্ছিল। ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল, আর খোলা বুকের ওপরে জোরে জোরে হাত ঘষছিল। নীরা লাফ দিয়ে উঠে আগে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। খাটের ওপর ছুটে এসে মীরাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। তখনই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, মীরার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি। সমস্ত মুখখানি কালি মাড়া। চোখের কোলে গভীর গর্ত, দৃষ্টি ভয়ার্ত কিন্তু স্তিমিত। ঠোঁট নীল, ঠোঁটের কষে ফেনা।

নীরা চীৎকার করে উঠেছিল, মীরা! কী করেছিস তুই? কী সর্বনাশ করেছিস?

মীরা একটু মাথা নেড়ে যেন নীরার কথায় সায় দিয়েছিল। তেমনি রুদ্ধ আর্তস্বরে বলেছিল, হ্যাঁ দিদি, আমি সর্বনাশ করে বসেছি। আমি বিষ খেয়েছি।

নীরা আর্তনাদ করে উঠেছিল, মীরা! মীরা!

মীরা অসহায় দু'হাত বাড়িয়ে নীরাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, আমাকে বাঁচাও দিদি, আমাকে বাঁচাও। আমি মরতে চাই না।

নীরাও মীরাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। ওর চোখে তখন ভয় আতঙ্ক হতাশা।

মীরা আবার বলে উঠেছিল, আমি বুঝতে পারিনি দিদি, আমার এখনো বাঁচবার সাধ। ভেবেছিলাম, দীপক আমার যে সর্বনাশ করেছে—

নীরা কেঁপে উঠে আর্তনাদ করে উঠেছিল, দীপক!

সেই মৃত্যু-বিষের জ্বালার মধ্যেও মীরা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল, হ্যাঁ দিদি, দীপকদা—দীপক—দীপক আমার সর্বনাশ করেছে। কারোকে বলতে পারিনি। ভয়ে কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমার মরাই ভাল। তাই—তাই আমি—উঃ দিদি, জ্বলে

যাচ্ছে, আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আমি বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচাও।

নীরার শরীর যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল। একটি নাম শুনে, ওর নিজেরই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই ও ডুকরে চিৎকার করে উঠেছিল, বাবা, বাবা! বাবা, শীগগির এস।

ততক্ষণে অনেকেই জেগে উঠেছিল। সকলেই নীরার ঘরে ছুটে এসেছিল। বাবার শরীর খারাপের কথা তখন আর নীরার মনে ছিল না। বাবারও সে কথা মনে ছিল না। চিৎকার শুনে তিনি ছুটে এসেছিলেন। নিচের থেকে বাবার সেক্রেটারি অবিনাশ চ্যাটার্জি দৌড়ে এসেছিলেন। তাকে দেখে আগেই নীরা বলে উঠেছিল, চ্যাটার্জি কাকা, এখুনি ডাক্তারকে টেলিফোন করুন। ডাক্তার ঘোষকে এখুনি আসতে বলুন। বলে দিন মীরা বিষ খেয়েছে। বলুন ঘুমের বড়ি খেয়েছে।

বাবা মধুসূদন রায় ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠেছিলেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের ওপর বসে, নীরার কোল থেকে মীরাকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলেন। হা হা স্বরে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মীরা, মীরু মা আমার, কেন, কোন্ দুঃখে তুই এমন সর্বনাশ করলি!

মীরার হাত তখন স্খলিত হয়ে পড়ছিল। বাবাকে ভাল করে জড়িয়ে ধরতে পারছিল না। চোখের পাতা একটু একটু করে যেন বুজে আসছিল। গলার ভিতর থেকে স্বর জাগছিল না। কোন রকমে ফিসফিস করে বলেছিল, পাপ···করেছি বাবা। বড় অপমান··· অন্যায়···অন্যায় আমার···

মধুসূদন অসহায় ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় একবার নীরার দিকে তাকিয়েছিলেন। নীরা দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

মধুসূদনের চোখ জলে ভাসছিল। বলেছিলেন, তুই আমার এইটুকু

মেয়ে। হাসছিস, ছুটে বেড়াচ্ছিস। তুই কী অন্যায় করবি, তুই কী পাপ করবি, মা। আমি তা বিশ্বাস করি না।

মীরা তখন মধুসূদনের কোলে এলিয়ে পড়ছিল। স্খলিত জড়ানো স্বরে বলেছিল, করেছি বাবা, করেছি। দিদির কাছে সব শুনতে পাবে।...কিন্তু বাবা, আমি বাঁচতে চাই, তোমাদের ছেড়ে যেতে চাই না...

মীরা দু'হাত তুলে ধরেছিল। নীরা তাড়াতাড়ি সেই দুটি হাত ধরে মীরাকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। ডেকেছিল, মীরা, এখুনি ডাক্তার আসছে, তুই বেঁচে উঠবি। মনে একটু জোর কর।

মধুসূদন কেঁদে উঠে বলেছিলেন, তোকে আমরা কেমন করে মরতে দেব। আমার কাছে কেন তুই সব বলিসনি। তোর দিদিকে কেন বলিসনি। তা হলে তোকে আমরা এই সর্বনাশ করতে দিতাম না।

মীরা মাথা নেড়েছিল, প্রায় চুপি চুপি স্বরে বলেছিল, বুঝতে পারিনি বাবা...বুঝতে পারিনি।...লজ্জায় অপমানে ভয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গেছলাম...

মীরা কথাগুলো বলছিল খুব নিস্তেজ ভাবে। চোখ চেয়ে থাকবার চেষ্টা করেও চেয়ে থাকতে পারছিল না। বুজে আসা অন্ধকার চোখের মধ্যে তারা দুটো ক্রমেই অনড় হয়ে উঠছিল। কেউ যেন মীরার মুখে, পরতে পরতে কালি মাখিয়ে দিচ্ছিল। ঠোঁটের কষে ফেনা গড়িয়ে পড়ছিল। ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলতে চাইছিল। নীরার মনে হয়েছিল, মীরা যেন বলছে, বাঁচাও, বাঁচাও...আমাকে বাঁচতে দাও...

পনের মিনিটের মধ্যেই পারিবারিক ডাক্তার ঘোষ ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তখন আর বিশেষ জীবনের স্পন্দন ছিল না। ডাক্তার তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ মীরাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন। গাড়ি প্রস্তুতই ছিল।

তবে, মীরাকে আর নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। নীরার খাটে, নীরার আর মধুসূদনের কোলে ভাগাভাগি করে, মীরার জ্বালা শেষ হয়েছিল। মীরার অর্ধেক শরীর ছিল নীরার কোলে, অর্ধেক মধুসূদনের। ডাক্তার ঘোষ শেষবারের জন্য মীরার নাড়ি দেখেছিলেন। পারিবারিক প্রৌঢ় ডাক্তাবের চোখে হতাশা ফুটে উঠেছিল। তিনি মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলেছিলেন, সব শেষ।

মধুসূদন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, শেষ? সব শেষ?

তারপরে আবার ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠেছিলেন। নীরা মৃত বোনের কোলে মুখ চেপে কেঁদে উঠেছিল।

নীরা আস্তে আস্তে উঠে বসল। চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছে। গায়ের চাদরটা দিয়ে ও চোখ মুছল। সদ্য ঘুম ভাঙা তাজা ভাবটি আর নেই। কান্নায় চোখ লাল। চোখের কোল ফুলে উঠেছে। মুখের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিল। কিন্তু মশারির বাইরে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নীরা ওর বিছানা আর খাটের ওপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

এই ঘর, এই সেই খাট আর বিছানা। তিন বছর আগে, এক শীতের ভোর ভোর অন্ধকারে, মীরা এখানেই নীরার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই বিছানার ওপরেই মীরার শেষ জ্বালা জুড়িয়েছিল। তিন বছর পরে, আজ সেই দিনটি নয়, যে দিনটিতে মীরা ভয়ে লজ্জায় অপমানে বিষ খেয়ে নিজের জীবন শেষ করেছিল। শেষ করেও, বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় এ ঘরে ছুটে এসেছিল। আজ মীরার জন্মদিন।

এই জন্মদিনেই, সেই কালো কুৎসিত বীভৎস দিনটির কথা মনে

পড়ে যায়। বড় বেশি করে মনে পড়ে যায়। অথচ নীরা বা ওর বাবা সেই আত্মহত্যার দিনটির কথা ভুলেই থাকতে চায়। কিন্তু থাকতে চাইলেও ভুলে থাকা যায় না। মীরার জন্মদিনের আলোয়, এ বাড়ির কোণে কোণে যেন অন্ধকার জমে ওঠে। গভীর ভারি অন্ধকার যেন আপনা থেকেই থমথমিয়ে উঠতে থাকে। ফুলের আর ধূপের গন্ধে, দীপের আলোয়, কোন কিছুতেই সেই অন্ধকারকে দূরে সরানো যায় না। বোধহয় আর কোন দিনই যাবে না। একটি জন্মদিনের ওপরে চির অন্ধকারের ছাপ পড়ে গিয়েছে। এ দিনটি যেন এ বাড়ির অত্যন্ত আদুরে ছোট মেয়ের জন্মদিনের স্মৃতি নয়। মৃত্যুদিনের শোক দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে ভরা।

গতকাল রাত্রে নীরা নিজের হাতে ফুল আর মালা কিনে এনেছে। এ বাড়িতে ওদের প্রকাণ্ড বাগান আছে। সেখানে নানা ফুলের সমারোহ। দুজন মালী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, সারাদিন কাজ করে। তাদের বলে দিলে ফুল আর মালার অভাব হত না। কিন্তু বাড়িতে কারোকে কিছু জানাতে ইচ্ছা করে না। জানাজানি করে বাড়ির সবাইকে ব্যস্ত করে তুলতে ইচ্ছা করে না। নীরার ইচ্ছা নয় যে, বাড়ির পাচক চাকর বাকর, বিভিন্ন কর্মচারী, সবাই এই দিনটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠুক। যতটা সম্ভব নীরবে আর নিঃশব্দে একটু স্মৃতিপালন করা যায়। জাঁকজমকের কোন ব্যবস্থাই নয়। নীরা নিজের হাতেই সমস্ত কিছু করে। করার এমন কিছু নেই। ধূপ দীপ জ্বালিয়ে, মীরার ফটোতে একটি মালা পরিয়ে দেয়।

নীরা ওর বাবাকেও যেন জানতে দিতে চায় না। না জানাই ভাল। জানলেই মধুসূদনের ভাবান্তর ঘটবে। কিন্তু তাঁকে জানাতে হয় না। তিনি সবই জানেন। সবই তাঁর মনে থাকে। মনে থাকার কথাটা, মধুসূদন মুখ ফুটে বলতে চান না। নীরাকেও বলেন না। মীরার স্মৃতি তিনি নিজের মনেই বহন করেন। নীরা যেন তাতে মনে

মনে কেমন একটা অপরাধ বোধ করে। অথচ তার কোন কারণ নেই।

গতকাল সারাদিন নীরা কাজে ব্যস্ত থেকেছে। অফিসে, ওর চেম্বার থেকে, কয়েকবার ওকে বাবার চেম্বারে যেতে হয়েছে কথা বলবার জন্য। জরুরি প্রয়োজনে ইন্টার-কনেক্‌টেড টেলিফোনেও কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু রাত পোহালেই যে মীরার জন্মদিন, সে বিষয়ে একটি কথাও হয়নি। নীরা ইচ্ছা করেই তোলেনি। ভেবেছে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টার মধুসূদন রায়, তাঁর নিজের কাজে যতটা ব্যস্ত থাকেন, থাকুন। অকারণ তাঁর মনে শোকের স্মৃতি জাগিয়ে না তোলাই ভাল। শোকের স্মৃতি ছাড়া আর কী বলা যায়। অন্যতম ডিরেক্টর, স্বয়ং নীরা রায়ও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছে। যদিও ব্যস্ত থাকতে পারেনি। নিজের কাছে নিজেই ভান করেছে। কিন্তু অফিসার আর কর্মচারীদের চোখে একেবারে ফাঁকি দিতে পারেনি। তারা প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, মিস রায় টেবিলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কাজের প্রসঙ্গে, হঠাৎ কথা হারিয়ে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত কাজের কথা মনে করতে পারেনি। অবাক অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। তারপরেই তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফাইল টেনে নিয়েছে।

নীরার আলাদা গাড়ি আছে। কিন্তু সারাদিন কাজের পরে, অধিকাংশ দিন বাবার সঙ্গে এক গাড়িতেই বাড়ি ফিরে আসে। কখনো কখনো কোথাও যেতে হলে নিজের গাড়িতে যায়। বাবাকে বলে দেয়, তুমি বাড়ি যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

কোথায় কী জন্য, সে কথা মধুসূদন কখনো জিজ্ঞেস করেন না। করার কোন কারণ নেই। তিনি জানেন, বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে নীরা বাবাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। তিনি শুধু বলেন, বেশি দেরি কোর না যেন।

নীরা জানে, বাবা একলা বাড়িতে থাকতে পারেন না। এক ঘরের মধ্যে বাবার সঙ্গে মুখোমুখি বসে থাকতে হয়না বটে, কিন্তু নীরা বাড়িতে আছে, বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলছে, গল্প করছে, তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত। নীরা তা জানে বলেই পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে থাকে না। ওর যারা বন্ধুবান্ধবী, সবাইকেই আমন্ত্রণ করে। ওর নিজেরও অনেক আমন্ত্রণ থাকে। ক্লাবে, বিভিন্ন সংস্থার সভায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, সিনেমায় থিয়েটারে। বাবাকে ছেড়ে ও প্রায় কোথাও যায় না। নিতান্ত এড়াতে না পাবলে যেতে হয়। সামাজিকতা একেবারে বর্জন করা যায় না।

গতকাল নীরা অফিস থেকে বেরোবার সময় লক্ষ্য করেছিল বাবাকে কেমন ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। তাঁকে একলা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু ও যে ফুল আর মালা কিনতে যাবে, সে কথাটা বাবাকে বলতে চায়নি। বলেছিল, বাবা, তুমি যাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।

মধুসূদন নীরাব দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, আচ্ছা। বেশি দেরি কোর না যেন।

নীবা বলেছিল, না বাবা, আমি একটু ঘুরেই চলে যাচ্ছি।

নীরা মার্কেট থেকে ফুল আর মালা কিনে বাড়ি ঢুকেছিল। কণাকে ফুল আব মালা দিয়ে বলেছিল, এগুলো ভালভাবে জল দিয়ে রাখ। সকালে যেন টাটকা থাকে।

নীরা ভেবেছিল কণা কৌতূহলিত হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে। কারণ কণা প্রায় এক বছর এ বাড়িতে এলেও মীরার গত জন্মদিনটির আগে আসেনি। গত বছর মীরার জন্মদিনের কয়েকদিন পরে কণা এসেছিল। সেই জন্যই আরো বিশেষ করে কণাকে ও ওর নিজের কাজে নিয়েছিল। মীরার অভাব কণা মেটাতে পারবে এমন কথা

ঠিক ভাবেনি। কণার মত একটি মেয়ে কাছাকাছি থাকলে অনেকটা ভাল লাগবে এ কথা মনে হয়েছিল।

কিন্তু কণা কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। কিছু জিজ্ঞেস করেনি। নীরার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে মালা আর ফুলের মোড়ক নিয়েছিল। কণার কাছ থেকে সরে যেতে গিয়ে নীরার হঠাৎ মনে হয়েছিল কণা কিছু জিজ্ঞেস করলে ও বিরক্ত হত না। মনে পড়ল কণাকে যে ওর ভাল লেগেছিল তার কারণ কণাও প্রায় মীরারই বয়সী। বিশেষ করে মীরা যে বয়সে মারা গিয়েছিল কণার এখন প্রায় সেই বয়স।

নীরার মনে হিসাব জেগে উঠল। হিসাব করে দেখল, মীরা বেঁচে থাকলে, আজ পঁচিশ বছর বয়সে পড়ত। একুশ বছরের জন্মদিন পার করে, মীরার জীবনে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। নীরার মনে আছে, মীরাব আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে, ওদের এই অভিজাত পাড়ায়, রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে আত্মহত্যার ঘটনাটি মেটেনি। পুলিশের একজন হোমরা চোমরা এসেছিলেন তদন্ত করতে। বাবার পক্ষে আপত্তি করার কিছু ছিল না। নীরা নিজেই পুলিশ অফিসারকে বলেছিল, শুধু এইটুকু অনুরোধ, দেখবেন কোন স্ক্যাণ্ডাল যেন ছড়িয়ে না পড়ে।

পুলিশ মহল সেই কথা রেখেছিল। তারা ঘটনাটা সংবাদপত্রে দেয়নি। কিন্তু ময়না তদন্তের নির্দেশ তারা দিয়েছিল। নীরা তাতেও আপত্তি করেছিল। ওর আপত্তি টেকেনি। মধুসূদন ঘটনার আকস্মিকতায় এবং শোকে দুঃখে এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, পুলিশকে একটি কথাও বলতে পারেন নি। অথচ মীরা একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল। ওর আত্মহত্যার কারণ এবং প্রমাণের ব্যাপারে, সেই চিঠিই অনেকখানি। এখনও সেই চিঠির কথা নীরার স্পষ্ট মনে আছে। চিঠিটা নীরার উদ্দেশেই লেখা ছিল। নীরাকেই

উদ্দেশ করে কেন, মীরার চিঠির প্রথম লাইনেই সে কথা লেখা ছিল ঃ

'দিদি, আমার এই কলঙ্কের কথা বাবাকে লিখে যেতে পারলাম না। মরবার মনস্থ করেও, বাবার কথা মনে করে, লজ্জায় আর অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। বাবাকে এ সব কথা লেখা যায় না। আমার উপায় নেই, আমাকে মরতেই হবে। আমি বিষ যোগাড় করেছি। আমার হাতের সামনেই রয়েছে, তার আগে, দিদি, তোমার তুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আসলে আমি তোমারই সর্বনাশ করেছি। তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কেমন করে করলাম কিছুই বুঝতে পারি নি। কবে থেকে এমন সর্বনাশের খেলায় মেতে গিয়েছিলাম নিজেও জানতে পারিনি। যখন জানলাম তখন আমার ফেরার উপায় নেই। আমার শেষ সর্বনাশ তখন হয়ে গিয়েছে। তুমি কি দিদি কিছুই বুঝতে পারনি? পেরে থাকলে আমাকে সাবধান করনি কেন? আমাকে শাসন করনি কেন, আমাকে ধরে মারনি কেন? আজকের এই সর্বনাশ আর অপমানের চেয়ে সেও যে অনেক ভাল ছিল। তবু আমি বাঁচতে পারতাম।

'আসলে তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারনি। পেরে থাকলেও নিজেকে গোপন করে রেখেছ। কেন জানি না আজ এই সময়ে আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়তো লুকিয়ে কেঁদেছও। তবু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারনি। তোমার হয়তো বুক ফেটেছে, অপমানে পুড়ে গেছে, তবু মুখে হাসি বজায় রেখেছ। নিজের অবস্থা কাউকে বুঝতে দাওনি। চুপ করে দূরে সরে থেকেছ।

'দিদি, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা করলে, আমার মরেও শান্তি। বাবাকে বোলো, তাঁকে আর এ মুখ দেখাবার নয়। তাই আমি মরছি। আমার বাবার মত লোকের মেয়ে হয়েও কেমন করে এমন কাজ করলাম, জানি না। এক সময়ে আমি সব কথাই বলে ফেলব ঠিক

করেছিলাম। কিন্তু যখনই মনে হল, আমি বুঝি তোমার হাত থেকে 'তাকে' কেড়ে নিচ্ছি, তখনই আমার মনে অপরাধের চিন্তা ফুটে উঠল। আমার আর মুখ খুলতে সাহস হয়নি।

'এ চিঠিতে আমি 'তার' নাম উচ্চারণ করলাম না। আমি জানি, সে অত্যন্ত দুর্বল এবং লোভী চরিত্রের মানুষ। গভীরতা দৃঢ়তা বলে 'তার' কিছুই নেই। কোন শিরদাঁড়া নেই। 'তাকে' আমি দুশ্চরিত্র লম্পট বলতে চাই না। কিন্তু সে কোনদিক থেকেই তোমার যোগ্য ছিল না। তোমাকে সে ভালবাসতে পারেনি। শ্রদ্ধা করত, ভয় পেত তার চেয়ে বেশি। ভাল সে কারোকেই বাসতে পারে না। জানে শুধু ভোগ করতে। অতএব 'তাকে' আমি দায়ী করে যেতে চাই না। দায় যা কিছু আমার। আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। দিদি, আবার বলি, আমাকে ক্ষমা কর। বাবাকে বোলো আমাকে যেন ক্ষমা করেন।

—ইতি হতভাগিনী মীরা।'

নীরা ভেবেছিল, মীরার সেই চিঠি দেখার পরে পুলিশ আর ঘাঁটা-ঘাটি করবে না। কিন্তু পুলিশ ছাড়েনি। মীরার মৃতদেহ ওরা নিয়ে গিয়েছিল। ময়না তদন্তে তাদের সন্দেহ নিরসন হয়েছিল। তদন্তের রিপোর্টেই জানা গিয়েছিল মীরা তখন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

নীরা ভাবছিল, চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চাদর দিয়ে মুখ মুছল। এ বাড়িটা ছিল আনন্দে উচ্ছল। সেই প্রথম নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ডাইরেক্টর, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কর্মঠ উদার হাস্যপরায়ণ স্নেহময় মধুসূদন রায় ভেঙে পড়লেন। সেই নিরানন্দ বিষণ্ণতার আবহাওয়া এখন তেমন গভীর ভাবে ছায়া ফেলে নেই। নিয়মিত কাজ-কর্ম বিশ্রাম ইত্যাদির মধ্যে গল্প গুজব হয়, হাসির শব্দও বাজে।

কিন্তু মীরা বেঁচে থাকতে এ বাড়িতে যে আবহাওয়া ছিল তা কোনদিনই ফিরে এল না।

নীরার মা মারা গিয়েছিলেন অনেক ছোটবেলায়। নীরার সামান্য একটু মনে আছে মাকে। মীরার একেবারেই ছিল না। মীরা সেজন্য নীরার কাছে প্রায়ই অনুযোগ করত, তোমার বেশ মাকে মনে আছে। আমি কেন কিছুতেই মনে করতে পারি না?

দুঃখের মধ্যেও নীরার হাসি পেত। বলত, কী করে তোর মনে থাকবে বল। তোর দু'বছর বয়সে মা মারা গেছে, আমার তখন পাঁচ বছর বয়স। আমারই কি ভাল করে মনে আছে নাকি। একটা ঝাপসা মুখ চোখের সামনে জেগে ওঠে। হাসি হাসি ঝাপসা মুখ। কিন্তু বাড়িতে মায়ের যে ফটোটা আছে, সেই মুখটা না। আমার যে মুখটা মনে পড়ে, সেটা অন্যরকম। ফর্সা রঙ, আর একটু চওড়া ভাবের মুখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা খোঁপা, কিন্তু ঘোমটা দেওয়া নেই।

মীরা হাঁ করে শুনত না, গিলত। তার পরেও দুঃখ আর অভিমানের সুরে বলত, আমি আর একটু বড় হওয়া পর্যন্ত কি মা অপেক্ষা করতে পারল না? বলতে বলতে মীরার চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠত। নীরারও বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত। কথা ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেত।

কিন্তু মা ওদের এত ছেলেবেলায় মারা গিয়াছিল, আর বাবা এবং বিধবা ছোট পিসিমা এসে এমন ভাবে বুক দিয়ে আগলে ধরেছিলেন, মায়ের অভাবটা ওরা অনুভব করার অবকাশ পায়নি। মায়ের অভাবটা বাবা নিজেই নিজের মধ্যে বহন করেছেন। তার কোন ভার কারোর ওপর চাপাতে চাননি। আজও হয়তো মায়ের স্মৃতি বাবার মধ্যে গভীর ভাবে আছে। থাকলেও তা তাঁর নিজের মধ্যেই। নীরা আর মীরাকে তিনি মানুষ করে তুলেছেন একটা আলোর

বৃত্তের মধ্যে রেখে। সেখানে কোন দুঃখ বা বিষণ্ণতার ছায়া পড়েনি।

নীরার জ্ঞান হওয়ার পর, বড় হওয়ার পরে, মীরার আত্মহত্যার অঘটনই এ বাড়িতে প্রথম শোকের অন্ধকার, বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছিল। মায়ের মৃত্যুর সময়ে বাবার যৌবন ছিল। সামলিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বাইরে তাঁর বিরাট দায়িত্বের কাজ, ঘরে নীরা আর মীরা, এই নিয়ে তাঁর জগতকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। রীতিমত সুখী আলোড়িত জগৎ। স্নেহ হাসি আনন্দের ঝংকার সেখানে সব সময়ে বেজেছে।

মীরার মৃত্যুর পরে বাবা কয়েকদিন অফিসে যেতে পারেননি। বসে থাকবারও উপায় ছিল না। বেরোবার জন্য তাঁকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল। নীরা বলেছিল, বাবা, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমি অফিসে যাব।

অফিসে যাবে? বাবার শোকমগ্ন চোখে বিস্ময়ের ঝলক লেগেছিল।

নীরা বলেছিল, হ্যাঁ, এখন থেকে তুমি আর একলা যেতে পারবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

বাবা নীরার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অফিসে গিয়ে কী করবে মা?

নীরা বলেছিল, কাজ করব।

কাজ করবে?

হ্যাঁ। তুমি তো আমাদের নিতান্ত মেয়ে করে মানুষ করনি। ছেলের মত করে সব শিক্ষা দিয়েছ। তুমি তো নিজেই কতদিন বলেছ, আমি আর মীরা কোম্পানির ডিরেক্টর। তুমি যখন থাকবে না, তখন আমরাই সব ভার নেব।

মধুসূদন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন। নীরা বুঝতে পারছিল, মীরার নামটা শুনে, তাঁর বুকের মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল। গলা

বুজে এসেছিল। কথা বলতে পারছিলেন না। নিজেকে সামলাতে সামলাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। নীরা বাবার বুকে হাত রেখে ডেকেছিল, বাবা।

মধুসূদন যেন একটু চমকে উঠেছিলেন, হ্যাঁ মা।

তারপরে একটু করুণ হেসে বালছিলেন, হ্যাঁ, তাই তো বলেছি মা, তোমরা দু'বোন, তোমরাই আমার সব। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর তোমরাই ভবিষ্যৎ ডিরেক্টর। ডিরেক্টর তোমরা এখনই, কেবল অফিসে বসনি। কিন্তু তোমরা কোনদিন অফিসে বসবে, সে কথা তো আমি ভাবিনি। এ পরিবারে আরো দুজন ডিরেক্টর আসবে। অফিস কারখানার সমস্ত দায় দায়িত্ব তারা নেবে, তা-ই তো ভেবেছি।

অর্থাৎ, তিনি ভেবেছিলেন, দুই মেয়ের বিয়ে দেবেন। দুই জামাই'ও কোম্পানির ডিরেক্টর হবে। অফিস কারখানার কাজ-কর্ম তারাই দেখাশোনা করবে।

নীরা বলেছিল, তোমার মনের কথা জানি বাবা। বলে নীরা একটু সময় চুপ করে ছিল। আবার বলেছিল, তুমি যা ভেবেছিলে, মীরা চলে যাবার পরে, আর তোমাকে সে ভাবে ভাবতে দেব না বাবা।

মধুসূদন নীরাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, তা বললে কী করে হবে নীরু। তোকে সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব আমি।

বিয়ে! এক মুহূর্তের জন্য নীরার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। স্ফুরিত ঘৃণায় ঝিলিক হেনেছিল চোখে। একটি মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মীরার শেষ চিঠির ছত্রগুলো ভেসে উঠেছিল চোখের ওপরে। মনে মনে বলেছিল, না, আর বিয়ের চিন্তা কোনদিন নয়। নীরা রায়ের সে সাধ সমূলে শেষ হয়েছে।

নীরা বাবাকে বলেছিল, এ কথা কেন বলছ বাবা। আমি কি সংসারে প্রতিষ্ঠিত নই? এ সংসার কি আমার সংসার নয়?

মধুসূদন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। এ সংসার তোর বৈকি। আজ

তোকে বাদ দিলে মধুসূদন রায়ের আর সংসার বলতে কী থাকবে। একটা শূন্য। কিন্তু সে কথা বলছি না নীরু। আমি তোর বিয়ের কথা বলছি।

নীরা দৃঢ় স্বরে বলেছিল, সে চিন্তা এখন থাক বাবা। মোটের ওপব আজ থেকে আমি তোমার সঙ্গে অফিসে যাব। কোন কাজ করতে না দাও, না দেবে। তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না আর।

মধুসূদন কথা বলতে পাবেননি। বোধ হয় আবার তাঁর গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। কন্যাব মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েছিলেন।

নীরা বলেছিল, তা ছাড়া, আমি সারাদিন এ বাড়িতে একলা কী করব ?

একলা ?

মধুসূদন বিস্মিত গলায় কথাটা উচ্চারণ করেই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। নীবা বুঝতে পারছিল, বাবা ওব একাকিত্বেব কথা শুনে অসহায় বিস্ময়ে অনেক কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন, এ বাড়িতে কন্যাদের এত বন্ধু বান্ধবীব আনাগোনা, খানা দানা, ছুটোছুটি, হই হুল্লোড়, সব সময়েই হাসি আনন্দ গান, তার মধ্যে নীরা একলা থাকবে কেন। তারপরেই হঠাৎ কী ভেবে যেন নিজেই চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, তাও তো বটে। বেশ, যে ক'দিন তোমার বাড়ি ভাল না লাগে, আমার সঙ্গে অফিসেই যাবে।

নীরা বুঝতে পেরেছিল, বাবা ওর মনোভাবকে নিতান্তই সাময়িক ভেবেছিলেন। তাই বলেছিলেন, যে ক'দিন তোমার বাড়িতে ভাল না লাগে ··। কিন্তু নীরাই শুধু জানত, মনে মনে ও কী স্থির করে নিয়েছিল। মীরার আত্মহত্যা যে ওর জন্মান্তর ঘটিয়েছিল, সে কথা ও বাবাকে তখন বলতে পারে নি। বলতে পারে নি, ওর একটা জীবনের ওপরে চিরদিনের জন্য একটা যবনিকা নেমে এসেছে। সে

যবনিকা আর নতুন করে কোনদিন উঠবে না। মীরার বিদায়ের সঙ্গেই একটা জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি আনন্দ, ভাবনা চিন্তা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, সব বিদায় নিয়েছে। আর একটা নতুন জীবনের সংক্রান্তি মুহূর্তে ও এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সে সব কথা ও বাবাকে বলতে পারেনি। বাবার কথার প্রতিবাদও করেনি। তাঁর সঙ্গে অফিসে বেরোবার সম্মতি আদায় করেই তখনকার মত নিরস্ত হয়েছিল। তবে বাবার সেই 'যে ক'দিন' আর শেষ হয়নি। মীরার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে সেই যে বাবার অফিসে বেরোতে আরম্ভ করেছিল, আজও তার শেষ হয়নি। শেষ হবার আর কোন উপায়ও মীরা রাখেনি। নীরা রায় এখন নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন দায়িত্বশীল ডিরেক্টর। এখন সে একজন ব্যস্ত কর্মী। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং এখন নীরা রায়কে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।

হয়তো সেটা সম্ভব হয়ে উঠত না। মধুসূদন যে রকম ভেবেছিলেন, সে রকম ভাবেই, কিছু দিন পরে, নীরাকে বাড়িতে এসে বসে থাকতে হত। কিন্তু মীরার মৃতুর এক মাস পার হতেই বাবার প্রথম স্ট্রোক হয়েছিল। তাঁর বুকে মীরার আত্মহত্যার আচমকা আঘাতটাই অনেকখানি ছিল। সে আঘাত কতখানি গভীর এবং ব্যাপক, তা তিনি নিজেই বোধহয় বুঝে উঠতে পারেননি। শোক তাঁর কোন্ মূল পর্যন্ত আক্রমণ করেছিল, অনুমান করা যায়নি। সবকিছু ভুলে থাকবার জন্য তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আগে স্বাভাবিক অবস্থায় যা করতেন না, তা-ই করতে আরম্ভ করেছিলেন। রোজ ফ্যাক্টরিতে যাওয়া আসা করছিলেন। অথচ আগে সপ্তাহে একদিন যেতেন কিনা সন্দেহ।

নীরা সঙ্গ ছাড়েনি। কিন্তু বাবাকে ওভাবে ছুটোছুটি করতে বারণ করেছিল। সকলেই বারণ করেছিল। বিশেষ করে, বাবার কাজে

কর্মে যিনি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী, ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জেনারেল ম্যানেজার বি কে বসু (ব্রজকিশোর বসু) বার বার এত পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছিলেন। নীরা শেষ পর্যন্ত বাড়ির ডাক্তারকে দিয়েও বাবাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। বাবা একটু হেসে সেই একই কথা বলতেন, কই, এমন বেশি কিছু পরিশ্রম করছি না তো। রোজ একবার ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি, এই যা।

নীরাই বলেছিল, তা-ই বা কেন যাবে বাবা। ফ্যাক্টরিতে কোন গোলমাল নেই। কাজকর্ম ভালভাবে তো চলছে।

মধুসূদন বলতেন, আমার মনটা একটু ভাল থাকে মা। খালি অফিসের কাজ করতে ইচ্ছা করে না।

এ কথা শুনলে নীরা বিশেষ কিছু বলতে পারত না। তা ছাড়া, মনে মনে একটু অস্বস্তি থাকলেও অশুভ কিছু চিন্তা করেনি। কিন্তু সেই অশুভ ঘটনাই ঘটেছিল। বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। সেই প্রথম স্ট্রোক। তেমন মারাত্মক কিছু না। তবু চার মাস তিনি অফিসে যেতে পারেন নি। বাবা যেতে চেয়েছেন, ডাক্তার কিছুতেই অনুমতি দেননি।

সেই চার মাসের মধ্যেই নীরার নতুন জন্মান্তরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে বাবাকে দেখা, অর্থাৎ সেবিকা, আর একদিকে নীরা রায় নামে একটি তরুণী নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন যোগ্য ডিরেক্টর রূপে জন্ম নিচ্ছিল। তখন বি কে বসুই ওকে সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। পাবিবারিক প্রথানুযায়ী ব্রজকিশোর বসুকে নীরা বোস কাকা বলেই ডাকে। ছেলেবেলা থেকে তা-ই শেখানো হয়েছিল। ঠাকুর্দার দ্বারা নিয়োজিত লোক তিনি। বাবারই বয়সী। ঠাকুর্দা বাবাকে যেমন খুব অল্প বয়সে ডিরেক্টরের দায়িত্ব দিয়ে কাজে টেনে নিয়েছিলেন, ব্রজকিশোর বসুকেও সেইরকম অল্পবয়সেই কাজে নিয়েছিলেন।

ঠাকুর্দা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। লোকচরিত্র বুঝতেন। কাজের

মানুষ চিনতেন। ব্রজকিশোরকে তিনি সামান্য একটি কেরানীর কাজ দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। ব্রজকিশোরও তাঁর গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁকে সমস্ত বিভাগে কাজ করিয়ে, কোম্পানির সমগ্র চেহারাটি অবহিত করিয়ে মধুসূদনের একজন যোগ্য সহকারী, না, সহকারী বললে ভুল হবে, যোগ্য সহযোগী হিসাবে তৈরি করে তুলেছিলেন। ব্রজকিশোর সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন। মধুসূদনের পরেই নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং পরিচালনার দায় দায়িত্বে কারো নাম করতে হলে, ব্রজকিশোব।

নীরা ছেলেবেলা থেকেই ব্রজকিশোরকে ওদের বাড়িতে দেখেছে। শুনেছে, ঠাকুর্দা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নিতান্ত কর্মচারি হিসাবে দেখতেন না। বাড়িতে ডেকে আনতেন, বাড়ির ছেলের মতই দেখতেন। ব্রজকিশোরকে বিয়ে দিয়ে, ঠাকুর্দাই সংসারে প্রতিষ্ঠা করে যান। নীরা শুনেছে, বাবার বিয়ের আগে ঠাকুর্দা ব্রজকিশোরের বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলতেন, এক ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এবার আর এক ছেলের বিয়ে দিতে হবে।

মধুসূদন আর ব্রজকিশোরের ব্যক্তিগত সম্পর্কও বিশেষ প্রীতি আর বন্ধুত্বপূর্ণ। দুজনে দুজনকে 'রায়' আর 'বোস' ডাকেন। অফিসে দশজনের সামনে 'আপনি' করে বলেন। ঠাকুর্দার প্রত্যাশা কোনদিক থেকেই বিফলে যায়নি। ব্রজকিশোর এখন নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিশেষ কর্তাব্যক্তি তো বটেই, রায় পরিবারে আত্মীয়ের থেকেও বেশি।

মধুসূদন একমাস পরে মোটামুটি আরোগ্য লাভ করেছিলেন। যদিও দুশ্চিন্তার শেষ হয়ে যায় নি। সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। এক মাস পরে, নীরা বাবার অনুমতি চেয়েছিল, তোমাকে দেখাশোনা করার পরে, আমি রোজ কিছু সময়ের জন্য অফিসে যাব।

মধুসূদন এক কথায় সম্মতি দিতে পারেন নি। বলেছিলেন, তুই আবার একা একা অফিসে যাবি কেন নীরু?

নীরা বলেছিল, আমি তো বোস কাকার সঙ্গে একটু আধটু কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলাম, আমার একটু শেখা হচ্ছিল। সেটা একেবারে বন্ধ করতে চাই না। তুমি অনুমতি দাও বাবা।

মধুসূদন নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সময় চুপ করে ছিলেন। বলেছিলেন, ভয় পাচ্ছিস কেন নীরু ?

নীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কিসের ভয় পাব বাবা ?

মধুসূদন সবাসরি জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, আমি তো এখনো আছি রে।

নীরা বলেছিল, তুমি আবাব কোথায় যাবে বাবা। তুমি তো থাকবেই। আমিও তোমার সঙ্গে আরো ভাল ভাবে থাকতে চাই।

মধুসূদন তথাপি চুপ করে ছিলেন। নীরা বলেছিল, আপত্তি করো না বাবা। আমাব যদি ভাল লাগে, আপত্তি করবে কেন। আমাকে একটু কাজকর্ম শিখতে দাও। বিজ্ঞান আর অর্থনীতি তো তুমি আর এমনি এমনি পড়াওনি আমাকে। আমিও তা পড়িনি। সেসব একটু কাজে লাগাতে দাও। আমার তাতে ভালই হবে।

মধুসূদন অন্যদিকে তাকিয়ে, চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়েছিলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁ রে নীরু, বাড়িটা আজকাল বড় চুপচাপ হয়ে গেছে। তোর বন্ধুরা কেউ আর আসে না ?

চকিত মুহূর্তের জন্য নীরার মুখে লাল ছোপ ধরে গিয়েছিল। বন্ধুরা বলতে বাবা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটা একেবারে স্পষ্ট না হলেও, এক মুহূর্তের জন্য লজ্জাটা রোধ করতে পারেনি। ও তাড়াতাড়ি বলেছিল, হ্যাঁ, কেউ কেউ আসে তো।

আমি তো দেখতে পাই না।

খুব কম আসে। তোমার শরীর খারাপ, তুমি কী করে দেখতে পাবে। কেউ কেউ আসে, একটু আধটু গল্প করি।

মধুসূদনের কপালে কয়েকটি রেখা পড়েছিল। নীরা দেখেছিল, অন্যমনস্ক চিন্তার রেখা।

ও আবার বলেছিল, তা ছাড়া, আমার আজকাল শুধু শুধু গল্প করতে ভাল লাগে না বাবা। কাজকর্ম নিয়েই আমি ভাল থাকি। আমার হাতে সময় নেই দেখে, অনেকে আজকাল আসে না।

মধুসূদন বলেছিলেন, তুই নিজেই বোধহয় সবাইকে বারণ করে দিয়েছিস ?

কথাটা একেবারে মিথ্যা না। মুখের ওপর কারোকে কিছু না বললেও, নীরার আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে, আগের মত হাসি গল্প আনন্দ নিয়ে ও আর থাকতে চায় না। থাকতে পারে না। মীরার মৃত্যু একদিকে যেমন অনেক কিছু ভেঙেচুরে দিয়েছে, তেমনি আর এক দিক থেকে নীরার মধ্যে কিছু গড়ে তুলতে চেয়েছে। সেই গড়ে তোলার সঙ্গে ওর পুরনো জগতের কোন মিল নেই। সেই পুরনো জীবন যাপন, পুরনো কথা, হই হুল্লোড় আনন্দ, গান বাজনা পার্টি বেড়ানো, সেসব কোন কিছুই ওর নতুন চিন্তার জগতে নেই। সে কথা ও মুখ ফুটে কারোকে কিছু বলেনি। ওর আচরণ থেকেই সবাই আন্দাজ করে নিয়েছে। যারা ওর উদাস এবং অমনোযোগী আচরণ থেকে ওকে বুঝতে পারেনি, তাদের জানিয়ে দিয়েছে, নীরা বাড়ি নেই। টেলিফোন এলে কোন সাড়া দেয় নি। তারপরে যখন সবাই দেখেছে, নীরা ওর বাবার সঙ্গে অফিসে ফ্যাক্টরিতে যাতায়াত আরম্ভ করেছে, তখন অনেকেই বুঝেছিল, নীরা আর সেই নীরা নেই। ওর অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

নীরা বলেছিল, বারণ কারোকে করিনি বাবা। কিন্তু আমার যে আর ওসব ভাল লাগে না। চিরদিন কি এক রকম ভাল লাগে। তুমি বোধহয় আমার জন্য মিছিমিছি ভাবছ ?

মধুসূদন বলেছিলেন, তুমি একেবারে সব ছেড়েছুড়ে এত কাজ নিয়ে মেতে উঠলে ভাবতে হয় বৈকি।

নীরা হেসেছিল। হেসে, বাবাকে প্রবোধ দিয়ে, নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিল। বলেছিল, কিছুই ছাড়িনি বাবা। এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় গিয়েছি। কাজকর্ম করতে গিয়ে কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, কথা বলতে হয়। আমি তাদের নিয়ে বেশ থাকি।

মধুসূদন একটি নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, দেখিস মা, যোগিনী হয়ে যাসনি যেন।

নীরার বুকে কথাটা খচ্ করে লেগেছিল। তথাপি হেসেছিল। বলেছিল, যোগিনী হব কেন বাবা। আমি একটা জাঁদরেল মেয়ে ডিরেক্টর হব।

মধুসূদন কিন্তু হাসেননি। বলেছিলেন, বেশ, যেতে চাস যা।

নীরা বলেছিল, তা হলে তুমি বোস কাকাকে বলে দিও।

মধুসূদন ব্রজকিশোরকে বলে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন বললে ভুল হবে। তিনি ব্রজকিশোরের মতামত চেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। নীরার সৌভাগ্য, ব্রজকিশোর আপত্তি করেননি। বরং তাঁর উৎসাহই ছিল।

তিনি বলেছিলেন, এ তো খুব ভাল কথা। আজকাল মেয়েরা কত কী করছে। নীরা যদি কোম্পানির কাজকর্ম বুঝে নিতে চায়, তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমি সর্বতোভাবে নীরাকে সাহায্য করব।

মধুসূদনই দ্বিধা করে বলেছিলেন, কিন্তু বোস, অন্য দিকটাও ভাববার আছে।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ দিক রায়। নীরার বিয়ে তো?

হ্যাঁ।

এতে চিন্তার কি আছে। নীরাকে যে বিয়ে করবে, সে নিশ্চয়ই এমন ছেলে হবে না, নিতান্ত একটি ঘোমটা টানা মেয়ের বর। নীরা আর তার ভাবী স্বামী, দুজনেই তো নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং দেখাশোনা করবে। তুমি বৃথাই ভাবছ রায়।

বলছ ?

হ্যাঁ, বলছি। নীরার এ মনোভাবকে আমি প্রশংসা করি। ওর অধিকার আছে সব কিছু শিখে নেয়ার। কেন ও একজন অকেজো ডিরেক্টর হয়ে থাকবে? তা ছাড়া, আমাদের নীরু মা ভাল করে লেখাপড়া শিখেছে, যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। এই যে সামান্য কিছুদিন ও তোমার সঙ্গে গিয়েছিল, তার মধ্যেই আমি ওর কিছু কিছু জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। দৃষ্টি ওর খুব সজাগ, সব দিকে লক্ষ্য আছে। ডিপার্টমেণ্টাল সমস্ত চীফদের সঙ্গেই আমি ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। নীরা তাদের সকলের সঙ্গেই অনায়াসে কথা বলেছে, মিশতে পেরেছে, শিক্ষানবীশের মত কাজকর্ম বুঝতে চেয়েছে। নীরার ব্যবহারে সকলেই সুখী।

মধুসূদন একটু অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এত কথা আমার জানা ছিল না।

ব্রজকিশোর বলেছিলেন, আমি অবিশ্যি ভেবেছিলাম, নীরা নিতান্ত কৌতূহল বশতই সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চাইছে, কাজের বিষয় বুঝতে চাইছে। তোমার কথা থেকে বুঝতে পারছি, নীরা পুরো-দস্তুর কাজকর্ম করতে চাইছে। আমি মনে করি, সেটা খুবই ভাল।

মধুসূদন বলেছিলেন, বেশ, তা-ই হোক। এক সময় মনে করতাম, ভবিষ্যতের সব কিছুই আমার হাতে। যা করবার আমিই সব করব। সেটা যে ভুল মনে করেছি, দু'তিন মাসের মধ্যেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। সে অহংকার আর আমার নেই। আমি কি জানতাম, মীরা এ ভাবে আত্মহত্যা করবে, আমি হঠাৎ এতটা অসুস্থ হয়ে পড়ব।

ভবিষ্যতে যদি এই থাকে, আমার নীরু নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন পুরোদস্তুর ডিরেক্টর হবে, তবে তা-ই হোক।

. ব্রজকিশোর বলেছিলেন, রায়, এতে তোমাব সৌভাগ্যই সূচিত হচ্ছে। নীরা একাধারে তোমাব ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই।

মধুসূদন বলেছিলেন, হয়তো তা-ই। তবু মন মানে না বোস। আমার মেয়েটা সুখী হলেই আমি সুখী।

ব্রজকিশোব উক্তি করেছিলেন, আমার মনে হয়, কাজকর্মের মধ্যে থাকলে নীরা সুখীই হবে।

মধুসূদন নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিলেন, তা হলে এ বিষয়ে সব ভার তোমার।

একশোবার। এই নতুন কাজটি পেয়ে আমিও সুখী।

দুজনের মধ্যে এসব কথাবার্তার বিষয় নীরা ব্রজকিশোরের কাছ থেকেই শুনেছিল। তারপর থেকে, নীরা নিয়মিত অফিসে যেতে আরম্ভ কবেছিল। ব্রজকিশোর অফিস যাবার পথে নীরাকে তুলে নিয়ে যেতেন। চাব মাস পরে তার প্রয়োজন হয়নি। মধুসূদনকে ডাক্তার আবার অফিসে যাবার অনুমতি দিয়েছিল। নীরা বাবার সঙ্গে যেত, কিংবা বলা যায়, ও বাবাকে নিয়ে যেত। তবে মধুসূদনের কাজকর্ম অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোন জটিল কাজ করা একেবারেই নিষেধ করা হয়েছিল। নিতান্ত যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকুই করার নির্দেশ ছিল।

সেই থেকে নীরার যাওয়া আর বন্ধ হয়নি। বন্ধ হওয়ার আর কোন প্রশ্ন নেই। নীরা রায় এখন নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি অপরিহার্য সত্তা। ডিরেক্টর হিসাবে ওর কাজ এখন মধুসূদনের থেকে বেশি। ওর এখন আলাদা অফিস ঘর। নীরা খুব সাধারণ অফিস ঘরই চেয়েছিল। ব্রজকিশোর তা শোনেননি। বলেছিলেন, ডিরেক্টরকে ডিরেক্টরের মতই থাকতে হবে। সব কিছুই মানানসই হওয়া চাই।

রীতিমত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আধুনিক সাজে সাজানো অফিস ঘর। সবই হয়েছিল ব্রজকিশোরের নির্দেশ এবং পছন্দমতন। মধুসূদন পর্যন্ত নীরার ঘর দেখে হেসে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ওহে বোস্, এ যা ডিরেক্টরের ঘর হয়েছে দেখছি, এর পরে তো আর আমার ঘরে কেউ যেতেই চাইবে না।

ব্রজকিশোরও ঠাট্টা করে জবাব দিয়েছিলেন, তুমি হলে সেকেলে ডিরেক্টর। তোমার বিরাট হলঘরের মত ঠাণ্ডা অফিস ঘর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেলভেট মোড়া চেয়ার, মোটা গালিচা পাতা, যাকে বলে রাজদরবার। ওটা হল বনেদি। একে বলে মডার্ন। এর টানটা তো একটু বেশিই হবে।

মধুসূদন বলেছিলেন, তাইতো দেখছি। বেশ ভালই হয়েছে।

ব্রজকিশোর আবার বলেছিলেন, তোমার ঘরে আর যাবার দরকারই বা কী। এখন থেকে না হয় সবাই এ ঘরেই আসবে।

মধুসূদন হেসেই বলেছিলেন, হ্যাঁ, নীরু আমার কাজকর্ম কেড়ে নেবার যোগাড় করেছে।

নীরা বলেছিল, ইস্! এত ক্ষমতা আমার এখনও হয়নি বাবা। তোমার সবকিছু কাজকর্ম যেদিন বুঝে নিতে পারব, সেদিন বুঝব, আমি কিছু করতে পেরেছি।

কথাটা মিথ্যা নয়। মধুসূদন রায় আগের তুলনায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ। কাজকর্মও তাঁর অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথাপি, ডিরেক্টর এম রায় নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর সর্বরক্ষক। তাঁর উপদেশ, পরামর্শ এবং কৌশল ছাড়া কোম্পানি চলতে পারে না। ব্রজকিশোর-এর দৃষ্টি এবং চিন্তা যথেষ্ট সজাগ। বিভাগীয় প্রধানেরাও সকলেই বিজ্ঞ, কর্মঠ, কাজ সম্পর্কে সচেতন। তবু মধুসূদন রায়ের পরামর্শ ছাড়া কারোরই চলে না।

নীরারও না। নীরাকে প্রতি পদেই বাবার কাছে যেতে হয়।

বিভিন্ন বিভাগের সকলের কাছেই ও কাজ শিখে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে। এখনো তা নেয়। কারণ, শেখবার কোন শেষ নেই। ওপরওয়ালার কোন গাম্ভীর্য নিয়ে ও কাজ শিখতে যায় না। কাজ শিখতে যায় শিক্ষানবীশের মতই। সকলের সঙ্গেই সম্পর্কটা ও সহজ করে নিয়েছে। অন্যান্যেরাও ওর কাছে সহজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নীরা জানে, ওর বিশেষ শিক্ষাটা বাবার কাছেই। বাবা একদিকে যেমন লেবার আর প্রোডাকশন বোঝেন, অন্য দিকে তেমন ফিনান্স আর মার্কেটও বোঝেন। বাবা হলেন ঠাকুর্দার উপযুক্ত উত্তরসূরী। সেই হিসাবে নীরা এখনো কিছুই না। নীরা চায়, ও হবে মধুসূদন রায়ের উপযুক্ত উত্তরসূরী।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। পর্দা সরিয়ে, চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে কণা ঢুকল। মশারির মধ্যে নীরাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হল সে। আখরোট কাঠের টি-পয়ের ওপর চায়ের ট্রে রাখতে গিয়ে, টাইমপিসটা দেখতে পেল। নীরা কণার দিকে সরাসরি তাকাল না। ও বুঝতে পারছে, কণা নিশ্চয়ই মনে মনে অবাক হচ্ছে। নীরা কোনদিনই এ ভাবে বসে থাকে না।

কণা চায়ের ট্রে রেখে, মশারি তুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, চা ঢালব বড়দি?

নীরা বলল, ঢালো।

কণা চা ঢেলে, নীরার দিকে কাপ এগিয়ে দিল। নীরা কণার দিকে না তাকিয়ে, কাপ নিল। অন্যান্য দিন সকালবেলা ওদের দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হয়। একটু হাসি বিনিময় হয়, যাকে বলা যায়, নিরুচ্চারে সুপ্রভাত জানানো। তারপরে কণা জিজ্ঞেস করে, কাল ঘুম হয়েছিল তো বড়দি? কথাপ্রসঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা

হয়। বাড়ির বিষয়ে সব কথা। ঝি চাকর পাচক বেয়ারা, কারা কী বলছে না বলছে, ইত্যাদি। নীরা যে আসলে কণার কাছ থেকে বাড়ির সকলের কাজের হিসাব নেয়, তা নয়। বা কণা যে কারো নামে অভিযোগ করে, তাও না। কণার কাছ থেকেই ও সকলের কথা জানতে পারে। কার কী দরকার, কার সঙ্গে কার ঝগড়া, কে কার পিছনে লেগেছে, কার কী সমস্যা, এসব নিয়েই কথা হয়। তার মধ্যে অনেক সময় হাসি ঠাট্টার ব্যাপারও থাকে। কণা কথা বলে ঘর গোছগাছ করতে করতে। নীরা কথা বলে চা খেতে খেতে।

আজ নীরা কোন কথা বলল না। চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দিল। কণার দিকে চোখ তুলে তাকাল না। কারণ জানে, ওর চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ওর বিষণ্ন মুখ থেকে এখনো হয়তো কান্নাব ছাপটুকু সব মিলিয়ে যায়নি। কী দরকার কণাকে এ মুখ এখন দেখিয়ে। ওর মনে মনে কী হচ্ছে, সে কথাও কণাকে জানাবার দরকার নেই। কণা হয়তো মনে মনে অবাক হচ্ছে, অনেক কিছু ভাবছে। তা ভাবুক। এ মুহূর্তে নীরার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

কণাও কোন কথা বলল না। নীরার চা খাবার পরে, কণার একটি বিশেষ কাজ, নীরার বাসি চুলগুলো জোরে টেনে আঁচড়ে দেওয়া। কণা চিরুনি হাতে করে এগিয়ে এল না। জিজ্ঞেস করল, বড়দি, চুল আঁচড়ে দেব?

নীরা বলল, না, থাক।

কণার সামান্য যেটুকু গোছগাছ করার তা-ই করতে লাগল। নীরা লক্ষ্য করল, কণার চোখে মুখে কোন কৌতূহল নেই, বরং একটু গম্ভীর ভাব। অকারণ কৌতূহল কণা কখনোই প্রকাশ করে না। মেয়েটির সেটাও একটা গুণ। নীরা জিজ্ঞেস করল, ফুল আর মালা যত্ন করে রেখেছো তো কণা?

কণা বলল, রেখেছি।

নীরা খালি কাপ ডিস বাড়িয়ে ধরল। কণা এগিয়ে এসে হাতে নিল। নীরা বলল, কণা, তুমি বোধ হয় জান না, আজ—

নীবাব গলায় কথাটা যেন আটকে গেল।

কণা বলল, জানি।

নীবার ছলছলে চোখে বিস্ময়। কণার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি জানো?

কণা হাতের কাপ ডিসের দিকে চোখ রেখে বলল, ছোড়দির জন্মদিন।

নীবা জিজ্ঞেস করল, কে বলল তোমাকে?

কয়েক মাস আগে আপনিই বলেছিলেন।

তাই নাকি? আমার তো মনে নেই।

আমাব মনে আছে। যেদিন বলেছিলেন, সেদিনটা ছিল—

কণা কথা শেষ করল না। নীরাব দিকে একবার তাকাল, আবার চোখ নামিয়ে নিল। নীরার চকিতে মনে পড়ে গেল, সেই দিনটা ছিল মীরার আত্মহত্যাব দিন। মনে পড়ে গেল, কণাকে ও নিজেই বলেছিল, তার বোন আত্মহত্যা করেছে। নীরা না বললেও কণা জানতে পারত। হয়তো জেনেও ছিল বাড়ির লোকদের কাছ থেকে। শুধু আত্মহত্যার কথাই বলেছিল, তার কার্যকারণ কিছুই ব্যাখ্যা করেনি। বাড়ির লোকেরা সত্যি মিথ্যা কিছু বলে থাকতে পারে কণাকে। কণা সে কথা কোনদিন কিছু বলেনি। নীরা বলল, হ্যাঁ কণা, তোমার ঠিকই মনে আছে। আমার বোনের আজ জন্মদিন।

নীরা চুপ করে বসে রইল। কণা নীরার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আবার কাজে মনোনিবেশ করল। কাজ শেষ করে কণা বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে দেখতে গেল, সেখানে সব জিনিস ঠিক ঠিক আছে কি না। সেখান থেকে বেরিয়ে এলে, নীরা বলল, দেখে এস তো কণা, বাবা জেগেছেন কী না।

কণা বলল, আপনার ঘরে আসবার আগেই দেখেছি, বাবা তাঁর ঘরে জেগে বসে আছেন।

জেগে বসে আছেন? নীরার ভুরু কুঁচকে উঠল। চোখে জিজ্ঞাসা। খানিকটা আপন মনেই বলল, এত তাড়াতাড়ি তো বাবা ওঠেন না।

কণা বলল, আমি একবার ওঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, জানালা খোলা। উনি বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসে আছেন।

নীরা ওর কোমরের কাছ থেকে চাদরটা টেনে সরিয়ে দিল। স্লিপিং গাউন নামিয়ে দিল পায়ের পাতার কাছাকাছি। খাট থেকে নামতে নামতে বলল, তাহলে আমি আর দেরি করব না। স্নানটা সেরে নিই।

কণা বলল, তাহলে আমি যাচ্ছি।

কণা বেরিয়ে গেল। নীরা দরজা বন্ধ করে দিল।

আবার যখন নীরা দরজা খুলল তখন অফিসে যাবার জন্য ও তৈরি। মীরার মৃত্যুর পরে রঙীন শাড়ি পরা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। সালোয়ার কামিজ বা অন্যান্য আঁট পোশাক তো অনেক দূরের কথা। কসমেটিকস্-এর ব্যবহারও একেবারে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন সে-সব বজায় রাখতে পারেনি। মধুসূদনের চোখে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, নীরু, আমার কথাটা একটু মনে রাখিস। আমার চোখের সামনে তুই এমন সাদা জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াসনে।

নীরা সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিল, সাদা কোথায় দেখলে বাবা। আমি তো বেশ পাড়ওয়ালা শাড়ি পরি।

মধুসূদন বলেছিলেন, আমার চোখে ওগুলো মোটেই সুন্দর লাগে না। রঙীন জামাকাপড় পরা কি ভুলে গেছ? আমার একটা মেয়ে, সেও যদি এরকম সেজে থাকে, আমার চোখে সয় না।

নীরা বলেছিল, এবার থেকে রঙীন পরব।

নীরা আবার রঙীন শাড়ি জামা পরতে আরম্ভ করেছিল। বাবার কথাগুলো ওর বুকের মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল। অথচ কয়েক মাস পরে হঠাৎ আবার রঙীন জামাকাপড় পরতে গিয়েও নীরার মনটা বারে বারে থমকে গিয়েছিল। মীরার মৃত্যুর জন্যই যে বাধা বোধ করেছিল, তা নয়। ওর সমস্ত শরীরের মধ্যেই যেন একটা প্রতিবাদ জেগে উঠেছিল। প্রতিবাদে মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখে জেগে উঠেছিল বিতৃষ্ণা। ও যে ভেবেছিল, পুরনো জীবনের কোন কিছুতেই আর ফিরে যাবে না। কিন্তু বাবা! বাবার কষ্টকে বাড়িয়ে তুলতে পারেনি। বাবার দৃষ্টি সজাগ। কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন, দেখেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, নীরা আপনা থেকেই আবার সাজগোজ করবে। যখন বুঝেছিলেন, সে আশা নেই, তখন আর না বলে পারেননি।

নীরা আবার রঙীন শাড়ি জামা পরতে আরম্ভ করেছিল। অনেক দিন পরে রঙীন শাড়ি জামা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজেকেই যেন অচেনা লেগেছিল। নিজেকে বড় উজ্জ্বল, বড় ঝকঝকে মনে হয়েছিল। অথচ পুরনো জীবনের তুলনায় সে ঔজ্জ্বল্য কতটুকু। কিছুই না। তখন রঙ জড়িয়ে থাকত সমস্ত শরীরকে ঘিরে। ফর্সা মুখের ওপরেও থাকত একটু রঙের ছোঁয়া। রক্তিম ঠোঁট দুটিকে আরো একটু রাঙিয়ে না তুলতে পারলে মন মানত না। ডাগর কালো চোখে কাজল না মাখলে মনে হত চোখের দৃষ্টি যেন তেমন স্পষ্ট হয়নি। সকলের দিকে তাকাবে কেমন করে। জামার ছাট-কাট একেবারে লেটেস্ট ডিজাইনের না হলেই যেন তখন শরীরে সহজ ছন্দটা জেগে উঠত না। নীরা নামে সেই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটির অঙ্গে যে একটি স্বাভাবিক হিল্লোল খেলা করত, মনের মত সাজ না থাকলে তাও যেন তেমন হিল্লোলিত হত না।

নীরা বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস চেপে রঙীন শাড়ি জামা পরেছিল। বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন জীবনে সেই নতুন, তাই

একটা লজ্জা আর সঙ্কোচের ভাব ছিল। বাবা ওর দিকে তাকিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, বাহ্, এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। বুঝলি রে নীরু, এখন আমার বড় রঙের দরকার। দু'চোখ ভরে কেবল রঙ দেখতে চাই।

বাবার চোখের সামনে সব কিছুই কতখানি বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই কথাটিতেই বোঝা গিয়েছিল। নীরা জানত, সেই বিবর্ণতা বাবার চোখের না, ভিতরের। একলা মীরা—না, শুধু মীরা নয়, তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, বাবার ভিতরের রঙ অনেকখানি শুষে নিয়েছিল। নীরা রঙীন হয়ে উঠলেও সেই রঙ আর পুরোপুরি ফিরে আসবে না। তবু নীরা রঙীন হয়েছিল। তবে সেটা শাড়ি জামাতেই। চোখে, ঠোঁটে, শরীরের আর কোথাও প্রলেপ লাগাতে পারেনি।

কিন্তু আজকের দিনটিতে তাও সম্ভব না। আজ নীরা রঙীন শাড়ি জামা পরেনি। পরতে পারেনি। বছরের এই দিনটিতে আর পরতেও পারে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীরা নিজেকে একবার দেখল। কালো পাড়ের একটি তাঁতের শাড়ি পরেছে। তথাপি যেন নিজেকে বড় উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। আটাশ বছরের নীরা। এখনো নিজের দিকে তাকালে নিজেই কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে। অথচ ওর এই রূপ আর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু করার নেই। ব্যথা আর গাম্ভীর্যে ও যেন থমথম করছে। কিন্তু প্রকৃতি ওকে দু'হাত ভরে এত দিয়েছে, সেটাকে কোন রকমেই আড়াল করে রাখা যায় না। সেই প্রকৃতি ওর বাবা মায়ের রক্তস্রোতের প্রবাহ দিয়ে, ওকে ভরিয়ে দিয়েছে। মীরাকেও তা-ই দিয়েছিল। বাবা প্রায় গর্ব করে বলতেন, দু'পাশে দুই মেয়ে নিয়ে চলে যাব। যেখান দিয়ে যাব সেখানে দ্যুতি ছড়িয়ে থাকবে। মেয়েদের রূপ নিয়ে বাবার ভারী অহংকার। বাবার অহংকারের উৎসটা বাইরে থেকেও এসেছে। মধুসূদন রায়ের দুই মেয়ের রূপ নিয়ে সকলের মুখে এক কথা।

দরজায় শব্দ হল। নীরা আয়নার কাছ থেকে সরে এসে দরজা খুলে দিল। কণা দাঁড়িয়ে আছে। নীরা বলল, তুমি ফুল আর মালা একটা রেকাবিতে করে মায়ের ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। বাবা কি করছেন জানো?

কণা বলল, বাবা চান সেরে পোশাক পরে বসে আছেন।

নীরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আজকের দিনটা বাবার মনে আছে তো? না থাকলেও নীরা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় না। বাবা যদি ভুলে থাকতে পারেন সেটাই ভাল। অন্যান্য দিনও বাবা মোটামুটি আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকেন। নীরা তৈরি হয়ে বাবাকে নিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে। সেখানে বসেই সকালবেলার খাবারের সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ পড়া, খবরের বিষয়ে কিছু আলোচনা কথাবার্তা হয়। তার মধ্যে এসে যোগ দেন ব্রজকিশোর—বোস কাকা। সেটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তিনি রোজ আসেন। খাবার খান বা না খান একটু চা বা কফি নিয়ে বসেন। রাজনীতির আলোচনাটাই বেশি হয়। না হয়ে উপায় নেই। এখন প্রতিদিনই রাজনৈতিক সংকট বাড়াবাড়ির দিকে।

নীরা মধুসূদনের ঘরে এসে দেখল, অফিসের পোশাক পরে তিনি একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখলেই বোঝা যায়, দৃষ্টি তাঁর অন্যমনস্ক। কি এক গভীর ভাবনায় যেন ডুবে আছেন। নীরা ঘরে ঢুকতে ওর দিকে ফিরে তাকালেন। নীরা জিজ্ঞেস করল, তুমি তৈরি হয়ে গেছ বাবা?

মধুসূদনের দৃষ্টির অন্যমনস্কতা ঘুচল না। বললেন, হ্যাঁ মা, তৈরি হয়েই আছি। তোমার হয়ে গেছে?

হ্যাঁ বাবা।

তাহলে উঠি, চল।

মধুসূদন উঠে দাঁড়ালেন। নীরা লক্ষ করে দেখল, বাবার চোখে

এখনো সেই অন্যমনস্কতা। তিনি এগিয়ে এসে নীরার কাঁধে একটি হাত রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, এখন আমরা তোমার মায়ের ঘরে যাব তো।

কথাটা শুনেই নীরার বুকে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ঝিলিক খেলে গেল। নীরা কি ভুলই না ভেবেছিল। বাবা কখনো এই দিনটিকে ভুলে থাকতে পারেন? তাঁর বুকে শুধু দাগ লেগে নেই, সারা বছর এই দিনটির জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁর ভাববিহ্বল অন্যমনস্কতা আর কিছুই না। বাবা মীরার কথাই ভাবছিলেন। ও তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ বাবা, আমরা এখন মায়ের ঘরে যাব।

চল।

নীরাকে তিনি ছাড়লেন না। ওর কাঁধে হাত রেখে গায়ের কাছে জড়িয়ে নিয়ে চললেন। মায়ের ঘরের দরজার সামনে এসে দেখা গেল, কণা ফুল আর মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা তার হাত থেকে রেকাবি তুলে নিল। ভেজানো দরজা ঠেলে বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকল। দেওয়ালের একদিকে নিচু চৌকির ওপরে পাশাপাশি দুটি বড় ফটো। একটি মায়ের আর একটি মীরার। এটা বাবারই নির্দেশ ছিল। মীরার ছবি মায়ের পাশে, এই ঘরে থাকবে।

মায়ের মৃত্যুর পরে এঘরে আর কেউ থাকেননি। মায়ের খাট বিছানা আলমারি, ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসপত্র, যা যেখানে যেমন ছিল তেমনিই আছে। কোথাও কিছু সরানো হয়নি। এ ঘর প্রতি-দিনই ঝাড়মোছ করে পরিষ্কার রাখা হয়। তথাপি ব্যবহারের অভাবে এই নির্জন একাকী ঘরটিতে কেমন একটা পুরনো ছাপ পড়েছে।

নীরা বাবার সঙ্গে ফটোর সামনে এসে দাঁড়াল। কেউ কোন কথা বলল না। প্রায় দু'মিনিট কাটবার পরে মধুসূদনের যেন হঠাৎ খেয়াল

হল। বললেন, হ্যাঁ, যা করবার কর, আমি তোমার মায়ের খাটে একটু বসি।

তিনি সরে গিয়ে খাটে বসলেন। নীরা এগিয়ে গিয়ে মীরার ফটোতে মালা পরিয়ে দিল। তুটো ফটোরই নিচে কিছু ফুল জড়ো করে রাখল। ধূপদানিতে ধূপকাঠি সাজানো ছিল। পাশেই দেশলাই রয়েছে। নীরা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল। আর কিছুই করার নেই। এই দিনটির জন্য আর কোন আড়ম্বরের ব্যবস্থাই নেই। মধুসূদনও চাননি। নীরাও চায়নি। এই দিনটিকে এই ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। স্মৃতিচারণের জন্য বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। একজন তার কন্যাকে, আর একজন তার বোনকে, এভাবেই স্মরণ করতে চেয়েছে। তাও দিনের বাকী সময়ের মধ্যে কোন অনিয়ম সৃষ্টি করে নয়। বাকী সারাদিন অন্যান্য দিনের মতই কাজে কর্মে অতিবাহিত হয়।

নীরা সরে এসে বাবার কাছে দাঁড়াল।

মধুসূদন বললেন, বস্ নীরু।

নীরা তাঁর পাশে বসল। নীরা এখন মনে করতে পারে না মীরার এই ফটোটা কে তুলেছিল। এনলার্জ করে এখন ফটোটা অনেক বড় করা হয়েছে। তু'দিকে চুল খোলা, ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসির আভাস। আয়ত চোখ মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, নীরার মনে হচ্ছে যেন ওর দিকেই মীরা তাকিয়ে আছে। এমন ছবি মীরার কম আছে। চোখের কটাক্ষে হাসির ঝিলিকে ঝলকানো ছাড়া মীরার ফটোই উঠত না। মীরা যে সব সময়ে হাসিতে ঝলকিয়ে থাকত। ওর চোখের কালো তারার দিকে তাকালেই মনে হত, বাঁধভাঙা হাসি সেখানে থমকে রয়েছে।

মধুসূদন বললেন, এ মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ ভাবতে পারে, এ মেয়ে পাপের কিছু জানত।

নীরা এ কথার কোন জবাব দিল না। মধুসূদন জবাবের প্রত্যাশাও করেন নি। তিনি নিজের মনেই বলছিলেন। আবার নিজের মনেই বললেন, পাপের কিছুই জানত না। অবুঝ শিশু যেমন খেলতে খেলতে সাপের মুখে গিয়ে পড়ে, তেমনি পড়েছিল।

নীরার বুকের মধ্যে যেন সহসা অন্ধকার ঘিরে এল। অন্ধকারের ছায়া ওর মুখে ফুটে উঠল। মধুসূদন নীরার পিঠে হাত রাখলেন,— কিছুই জানতে দিল না। পাপ পাপ করে সব কিছু ছেড়ে চলে গেল। ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা বোধ বুদ্ধি ছিল। মাথাটাই খারাপ করে ফেলেছিল। আমাদের কথা ভুলে গিয়েছিল, আমরা বা ওর···।

মধুসূদনের স্বর বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর কথা শুনতে শুনতে নীরার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। গলার কাছে যেন কিছু ঠেলে আসতে চাইছে। ও ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইল। কিন্তু চোখ শুকনো রাখতে পারল না। মীরার ছবিটা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল।

দুজনের কারোর মুখেই খানিকক্ষণ কথা শোনা গেল না। মধুসূদন-এর চোখে জল নেই, কিন্তু তার ভিতরে ঝরছে, বোঝা যায়। বাইরের থেকে নিজেকে স্থির আর শান্ত রাখতে চাইছেন।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার তাঁর গলার স্বর শোনা গেল, মীরা বেঁচে থাকলে এখন কত বছর বয়স হত ওর?

নীরা কেশে, গলা পরিষ্কার করে বলল, পঁচিশ।

মধুসূদন উচ্চারণ করলেন, পঁচিশ।

তারপরে তাঁর যেন খেয়াল হল, নীরা কাঁদছে। ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কাঁদিসনে নীরু। কেবল জীবন মরণ বলে বলছি না, এখন মনে হয়, সংসারের অনেক কিছুই মানুষের নিজের হাতে নেই।

নীরা এতক্ষণে কথা বলল, তা জেনেও মন মানতে চায় না। মীরার সামনে এসে দাঁড়ালে সে কথা আরো বেশি করে মনে হয়।

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বললেন, তা ঠিক। যা মানুষের হাতে নেই, সেই পরিণতির জন্যই তাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

একটু থেমে আবার বললেন, তোর মা আগে গিয়েছিল, তা-ই এসবের কিছুই সে জানল না। কিন্তু এসব কথা থাক। তোর তো মনে আছে, মীরু আমাদের ছেলেবেলায় খুবই দুষ্টু ছিল, তাই না?

নীরা বলল, কেবল ছেলেবেলায় কেন বাবা। বড় হয়েও দুষ্টু কম ছিল নাকি? কাকে কখন কি বলবে, কার পিছনে লাগবে, সেই ভেবে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। আর একবার যদি কারো সঙ্গে একটু তর্ক লাগাতে পারত, তা হলে তো কথাই ছিল না। ওর কথার তোড়েই সবাই ভেসে যেত।

মধুসূদন যোগ করলেন, হাসির তোড়েও। কথা হাসি, কোনটাতেই ওর সঙ্গে পারবার যো ছিল না। অথচ বোকা ছিল না মোটেই। আমি ওর কথা শুনলে অবাক হয়ে ভাবতাম, এত কথা জানে কি করে, ভাবে কি করে। বলতে বলতে হঠাৎ যেন একটু হেসে উঠলেন। বললেন. সেই কি বলে, আজকাল সব ছেলেমেয়েরাই নাচে। তোকে অবিশ্যি কোনদিন নাচতে দেখিনি। কি নাচ রে সেটা?

নীরার ঠোঁটেও যেন একটু হাসির আভাস দেখা দিল। বলল, তুমি বোধ হয় টুইস্টের কথা বলছ?

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। সেই একবার মীরারই জন্মদিনে, ওর বন্ধুরা সকলেই নাচল। মীরাও নাচল। সে নাচ দেখে তো আমি হেসেই বাঁচি না। ওটাকে যে আবার নাচ বলে আমি তা-ই বুঝতে পারিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, আমার সামনে একদল ছেলেমেয়ে শরীরের অদ্ভুত বিকট অঙ্গভঙ্গি করছে। পরে সে কথা বলেছিলাম বলে আমার সঙ্গে কি তর্ক। আমাকে বুঝিয়ে ছেড়েছিল ওটা একটা ভাল নাচ এবং কষ্ট করে শিখতে হয়।

নীরার ঠোঁটের হাসি যেন আর একটু স্পষ্ট হল বাবার কথা শুনতে

শুনতে। মীরা সত্যি খুব ভাল নাচতে পারত। কেবল টুইস্ট নয়, পাশ্চাত্ত্য যে কোন নাচেই মীরার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। নীরাও নাচতে জানে। কিন্তু মীরার মত না। বলল, ওর নাচ দেখে সবাই প্রশংসা করত।

মধুসূদন বললেন, একটু পাগলীও ছিল আমার এই মেয়েটা। তোকে তো কোনদিন ওরকম নাচতে দেখিনি। তুই বুঝি শিখিসনি?

নীরা যেন লজ্জা পেল। বলল, একটু একটু শিখেছিলাম।

মধুসূদন বললেন, তোকে দেখে ঠিক তা মনে হয় না। মীবার মতন একটু পাগলী না হলে ও সব যেন ঠিক মানায় না।

নীবা বলল, পাগলী না বাবা, মীরা ছিল প্রাণবন্ত।

তা ঠিক। একেবারে টগবগে মেয়ে। অথচ—

মধুসূদন চুপ করে গেলেন। নীরা জানে বাবা কি বলতে চাইছিলেন, অথচ সেই মীরার মত মেয়েকে মাত্র একুশে পড়তে না পড়তেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হল।

নীরা বলল, আসলে এত ছেলেমানুষ ছিল, ভীষণ ভয় পেয়েছিল।

মধুসূদন বললেন, ঠিক বলেছিস, ভয় পেয়েছিল। ভয় পেয়েছিল, লজ্জাও পেয়েছিল। তাই মুখ খুলতে পারেনি। অথচ একবার যদি মুখ খুলতে পারত। আমি তো জানি, তার লজ্জা বা ভয় পাবার কিছুই ছিল না।

নীরা বলল, সে কথা আমরা জানি বাবা, মীরা জানত না। তুমি ঠিকই বলেছ, ওর মাথার ঠিক ছিল না।

মধুসূদন ঘাড় নাড়লেন। মীরার ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরে হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, অথচ নীরু, আমরা তো কারো ক্ষতি করিনি।

নীরার বুকে কথাটা যেন শেলের মত বিঁধল। কারোর বলতে, বাবা কার কথা বলতে চাইছেন, নীরা তা জানে। কথাটা ওর বুকে

শুধু বিঁধল না, মুখে যেন কালি লেপে গেল। অথচ তার কোনো কারণ নেই। মীরার আত্মহত্যার মধ্যে ওর কোন পাপ নেই। মধুসূদনও নিশ্চয় সে কথা বলতে চাননি। তবু মনটা কেমন অতর্কিতে কালো হয়ে ওঠে। মীরার শেষ চিঠিটা কেবল চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

মধুসূদন নীরাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে যেন নিজের মনেই বললেন, কেবল যে আমার মীরা গেছে তা-ই না। আরো অনেক ক্ষতি হয়েছে।

নীরা বুঝতে পারছে, শেষের কথাটা ওর উদ্দেশ্যেই। নীরার বলতে ইচ্ছা করল, ওর কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেনি। কিন্তু বলল না। দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে নীরা বলল, চল বাবা, এবার উঠি।

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ চল।

নীরা মধুসূদনকে নিয়ে বাইরে এল। নিজের হাতেই দরজাটা টেনে দিল। কণা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। নীরা কোন-কথা না বলে বাবার সঙ্গে খাবার ঘরে এল। ব্রজকিশোর আগে থেকেই এসে বসেছিলেন। খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। দুজনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন।

মধুসূদন বললেন, এসে গেছ?

ব্রজকিশোর কাগজ সরিয়ে রেখে বললেন, এই একটু আগেই এলাম।

মধুসূদন চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আজ একটু নীরুর মায়ের ঘরে গিয়ে বসেছিলাম। মীরার আজ জন্মদিন।

ব্রজকিশোর কেবল উচ্চারণ করলেন, ও।

বেয়ারা নীরার দিকে তাকিয়ে ছিল অনুমতির অপেক্ষায়। নীরা তাকে খাবার পরিবেশন করতে বলল। খাবার পরিবেশিত হল।

কিন্তু আজ সকালবেলার খাবারের টেবিলের আসর জমল না। সকলেই প্রায় চুপচাপ। সামান্য দু-একটা কথাবার্তা হল। খাবারের শেষে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ টেনে নিলেন সবাই। কোন আলোচনা হল না। এক সময়ে সবাই কাগজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। অফিসে বেরোবার সময় হয়েছে।

অফিসে এসে নীরা ওর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে গিয়ে বসল। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত কাজে কোন উৎসাহ বোধ করল না। এই ঘরে এই টেবিলের কাগজপত্রে ওর মন নেই। ওর মন আজ অন্য জগতে, অন্যখানে। সে কথা কারোকে বলা যাবে না, অথচ কাজে ওর কোন উৎসাহ না থাকলেও, যাদের ওপরে কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে, তারা সবাই একে একে আসতে আরম্ভ করল। নীরা বুঝতে পারছে, তাদের চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। মিস রায়কে তারা এরকম বিষণ্ণ চুপচাপ নিরুৎসাহ কোনদিন দেখেনি। গত বছর ঠিক এই দিনটিতে দেখে থাকলেও, সে কথা তাদের মনে নেই।

নীরা সবাইকে জানিয়ে দিল, আজ ও একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকবে। কেউ যেন ওর ঘরে না আসে। তারপরে ওকে ঘিরে ধরল অন্য এক জগৎ। পিছনে ফেলে আসা আর এক জগৎ। এটা ওর স্মৃতিচারণ নয়। পিছনের সেই দিনগুলো আজ জোর করে ওর মনের জগতে ঢুকছে। সেই দিনগুলো ওকে আজ রেহাই দেবে না। ভুলে থাকতে চাওয়া স্মৃতিতে আঘাত করে, খুঁচিয়ে, ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইছে।

প্রথমেই ওর চোখের সামনে যে মানুষটি ভেসে উঠছে, সে একজন যুবক। শুধু একজন যুবক মাত্র না। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, কিন্তু শিশুর

মত কোমল, চোখের দৃষ্টি স্বপ্নিল। একদা মনে হয়েছিল দেবশিশুর মত সরল কোমল নিষ্পাপ। সে যে পাপী, আজও সে কথা মনে হয় না। সে যে জেনে শুনে কোন পাপ করতে পারে, তাও প্রমাণিত হয়নি। শিশু যেমন তার ন্যায় অন্যায় বোঝে না, অনেকটা সেইরকম। সে কি করেছে যেন সে নিজেই জানে না। নীরা যদি তাকে ছেলেবেলা থেকে জানত, মিশতে পারত, তাহলে হয়তো বুঝতে পারত। অল্প জলে খেলতে খেলতে গভীর জলে গিয়ে পড়ত না। সাবধান হতে পারত।

কিন্তু সে এসেছিল আচমকা। নীরা তখন তেইশটি বর্ষার বর্ষণে ভরপুর, জোয়ার ওর কূলে কূলে, কানায় কানায় ছাপাছাপি। যদিচ, বাইরে তা নিতান্তই শান্ত। ভিতরেও ওর নিজের ব্যক্তিত্ব বিবেচনা বুদ্ধি কম ছিল না। ওর চারপাশে এখন অনেক ভিড়, উৎসবের মেলার মত। সকলেই সেই নিস্তরঙ্গ ভরা কূলে বাতাস তুলতে চেয়েছিল, ঢেউ জাগাতে চেয়েছিল। পারেনি। অথচ নীরা নিরুৎসবের অন্ধকারে মুখ গুঁজে থাকেনি। সকলের সঙ্গে সমান তালে চলেছে, মিশেছে হেসেছে খেলেছে গেয়েছে। উৎসব থেকে সরে যায়নি।

সে উৎসব ওর ভিতর দুয়ারটাকে খুলতে পারেনি। একজন এসে খুলে দিয়েছিল। কেমন করে খুলে দিয়েছিল, আজ আর নীরা যেন তা ভাল করে বুঝতে পারে না। ভাবলে, যন্ত্রণার থেকেও একটা মর্মাহত অসহায় বোবা বোধ জেগে ওঠে। একটা বিস্ময় আর ধিক্কার ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এখন কেবল এইটুকু মনে আছে, দুটি স্বপ্নিল চোখ যেন প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। যে প্রদীপ দুটি নীরার সামনে এসে ওর রূপের আরতি করেছিল। যে প্রদীপের আলোয় ওর গুণের স্তুতি ঝকঝকিয়ে উঠেছিল।

'কিন্তু সে রকম তো অনেক প্রদীপের আলোই ফুটেছিল। নীরার ভিতর দুয়ারের খিল তো খুলে যায়নি। তার সেই দৃষ্টির মধ্যে আরো

কিছু ছিল। শিশুর মধ্যে যে কোমলতা থাকে, একটি অজ্ঞান অসহায়তা থাকে, সেইরকম কিছু ছিল। যে আপনা থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, যাকে বুদ্ধি আর বিবেচনা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সে তখন সদ্য ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। যেন সারা পৃথিবীতে কিছু না পেয়ে নীরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর নীরার মধ্যেই সে তার স্বপ্নকে দেখতে পেয়েছিল। সে কথা সে অনেকবার পাখির শিস্ দেবার মত নীরার কানে গুঞ্জন করেছে। সে এসেছিল তার বাবার সঙ্গে। তার বাবা নামকরা ব্যারিস্টার। তার চেয়ে, ব্যারিস্টারের সুনাম দুর্নাম দুইই বেশি ছিল রাজনীতিতে। ব্যারিস্টার আর. এল. মুখার্জি মধুসূদন রায়ের বন্ধু। তাঁর ছেলে দীপক মুখার্জি, দীপক, যে নাম শেষবার উচ্চারিত হয়েছিল মীরার মুখে। শেষবার, মীরার মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে আকণ্ঠ বিষের জ্বালায় যখন নীরার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন সেই নাম উচ্চারিত হয়েছিল। সে নাম আর কখনো সশব্দে উচ্চারিত হয়নি।

পাঁচ বছর আগে দীপক যেদিন এসেছিল, সেই দিন প্রথম দর্শনেই নীরার স্তব্ধ কূলে সহসা কোন্ দিক থেকে বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঢেউ লেগেছিল। দীপকের মুগ্ধতা ছিল এত গভীর আত্মহারা, যে গুরুজনদের কথাও তার মনে ছিল না। তার চোখের প্রদীপে আরতি দেখা গিয়েছিল। নীরা ওর বুকে ঢেউ নিয়ে সরে এসেছিল। মনে হয়েছিল, এ কি অবুঝ শিশু! নীরার সবই মনে আছে, প্রথম দিনের এক ঘণ্টা আলাপের পরেই একটু নিভৃতে পেয়ে দীপক বলেছিল, মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

নীরা একটু বক্র হেসে, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি কথাটা বুঝে ফেললেন কেমন করে?

দীপক সেই বিদ্রূপ গায়ে মাখেনি। তার স্বপ্নের ঘোর একটুও কাটেনি। বলেছিল, তা বলতে পারব না। তবে এটা বোঝাবুঝির

ব্যাপার না, যা সত্যি দেখতে পেলাম তাই বললাম। আপনাকে যদি আগে দেখতে পেতাম, তা হলে আমি বাইরে যেতাম না।

নীরা বিদ্রূপ করেই হেসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, বিদেশে আপনি কাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন?

দীপক বলেছিল, বিশেষ কারোকেই না। কিন্তু মন যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কারোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

নীরা বলেছিল, আপনার বাবা বলছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল, আপনি বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করবেন।

—কিন্তু আমি বাবাকে বলেছিলাম, পড়াশোনা করার জন্য আমি বিদেশে যাচ্ছি না। বিদেশকে আমি দেখতে যাচ্ছি।

নীরা অবিশ্বাসের হাসি হেসে আবার বলেছিল, কিন্তু আমার মধ্যে হঠাৎ এমন কী দেখতে পেলেন যে এরকম করে বলছেন।

দীপক তাব দুই চোখের উজ্জ্বল প্রদীপ মেলে ধরে বলেছিল, তা বলতে পারব না। আমার এই যুক্তি ব্যাখ্যাহীন কথার জন্য। আমি নিজেই হেল্‌পলেস্ ফীল করছি। আপনাকে দেখে আমার যা মনে হল তা-ই বললাম। মনে হচ্ছে, এমন একজনকে আমি আর কখনো দেখিনি, অথচ দেখতে চেয়েছিলাম, দেখতে পেলাম।

লোকটা মিথ্যুক, না ভাবুক, না শিশু নীরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু তার সেই স্বপ্নমুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি। ওর মুখে রঙ লেগেছিল। ওর বুকে ঢেউ লেগেছিল। শুধু ঢেউ না, তার সঙ্গে স্রোতের তীব্র টান ছিল। ওকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। যদিও মেয়েদের প্রকৃতিগত কারণেই, নিজের অবস্থাটা ও দীপককে বুঝতে দেয়নি। ব্যাপারটা যেন একটা আবেগপ্রবণ ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু না, এবং নীরা সেটাকে হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না, এইরকম একটা ভাব করেছিল। ঠোঁটের কোণে চোখের ঝিলিকে অবিশ্বাস আর বিদ্রূপের আভাস ফুটিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু শিশু যেমন কিছুই বোঝে না, সে শুধু তার ইচ্ছা আর আবদার নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে, দীপকের অবস্থাটা ছিল সেইরকম। সে বলেছিল, দেখা যখন পেলাম, প্রতিদিন দর্শনের অনুমতিটা যেন পাই।

নীরা একই ভঙ্গিতে হেসে বলেছিল, রইল সেই অনুমতি। আপনি বাবার বন্ধুর ছেলে। যেদিন খুশি আসবেন।

দীপক সেই কথার ধার কাছ দিয়ে যায়নি। সে বিদেশ ঘোরা ছেলে, বিলিতিয়ানার পরিবেশে মানুষ। তথাপি তথাকথিত বিলিতি চাল রক্ষা করে কথা বলেনি। বরং বলতে গেলে অনেকটা বাচালের মতই বলেছিল, বাবার বন্ধুর ছেলে হিসাবে যেদিন খুশি আসবার অনুমতি আপনার কাছে চাইনি। আপনার কাছে অনুমতি চেয়েছি আপনার কাছে আসব বলে। যে অনুমতিটা অন্য কারো কাছ থেকে পেলে হবে না, এবং সেটা প্রতিদিনের জন্য।

সোজা এবং সরল কথা, তার মধ্যে কোন দ্ব্যর্থতা ছিল না। সেটাও দীপকের একটা বৈশিষ্ট্য। কথা বাড়ালে বাড়ানো যেত। নীরা তা বাড়ায় নি। যেন মজা পেয়েছে দীপকের কথা শুনে, এমনি একটা ভঙ্গিতে হেসেছিল, বেশ তো, আসবেন।

দীপক বলেছিল, এই কথাটুকুই যথেষ্ট। হাতে পেয়ে গেলাম যেন স্বর্গের চাবিকাঠি। কৃতজ্ঞতার থেকে বেশি, খুশিতে আমার মনটা ভরে উঠছে।

নীরা ভেবেছিল দীপক বুঝি ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে উঠবে। কিন্তু হাততালি দেয়নি। তার চোখের প্রদীপকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল। মুগ্ধ আবেগে জ্বলজ্বল করছিল তার মুখ। স্বপ্নাবিষ্টের মত তাকিয়েছিল নীরার দিকে। যে তাকানো কোন ব্যক্তি, পরিবেশ, এবং কিছুই মানে না।...

তারপর থেকে দীপক প্রত্যহ আসতে আরম্ভ করেছিল। নীরা

নিজেও খেয়াল করেনি, সেই প্রাত্যহিকতার স্রোতে ও কবে ভেসে গিয়েছিল। মনে করতে পারে না, সেই প্রত্যহের মধ্যে কবে থেকে ওর ভিতরেও একটা অপেক্ষা জেগে উঠেছিল। একজনের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করা, ওর জীবনে সেই প্রথম আর নতুন। অপেক্ষা, কখন সেই বিশেষ গাড়িটির শব্দ শোনা যাবে, পায়ের শব্দ গলার স্বর বেজে উঠবে!

অল্পদিনের মধ্যেই কত অনায়াসে দীপক আপনি থেকে 'তুমি'-তে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নীরার মনে আছে দীপকের সেই কথাগুলো, আমি আর 'আপনি' বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। বেড়াটা না টপকালে আর চলছে না।

দীপকের সেটাই ছিল অনুমতি চাওয়ার ধরন। নীরাকে মুখ ফুটে অনুমতি দিতে হয়নি। দীপক নিজে থেকেই 'তুমি' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। নীরাও যে কবে থেকে সেই সম্বোধনে ডেকেছিল, মনে করতে পারে না। অথচ, অনেক আগেই ওর মনে হয়েছিল, দীপকের মত ছেলেকে আপনি করে বলা যায় না। তবু নিজে আগে থেকে বলতে পারেনি।

যতই দিন যাচ্ছিল, ততই বোঝা যাচ্ছিল, দীপকের সঙ্গে নীরার অমিলটাই বেশি। বেশির ভাগ সময়েই মনে হত, দীপক যেন অনেকটা আবেগপ্রবণ প্লে-বয় টাইপ। অজস্র স্বপ্নমাখা প্রেমের কথায় কথায় সে প্রগল্‌ভ। সেজন্য তার স্থান কালের দরকার হয় না। কারো দিকে দৃকপাত করার প্রয়োজন হয় না। সে আবেগে ভরে আছে, আবেশে ডুবে আছে। কিন্তু সে একলা থাকতে পারে না, চলতে পারে না। একলা আপন মনে গভীর ভাবে কিছু ভাবতে পারে না। একজনকে —নীরাকে নিয়ে সে মেতে থাকতে চায়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর সঙ্গে কেবল আকুতি ভরা মুগ্ধ প্রাণের কথায় বাজতে চায়। নীরাকে নিয়ে ছুটে যায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কখনো ছুটিয়ে

নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের ধারে। কখনো নদীর তীরে, মাঠের মাঝখানে। খোলা আকাশের তলায় নীরাকে বসিয়ে বলে, এখানে বসে তোমাকে একটু দেখি। খোলা আকাশের নিচে এই প্রকৃতি কত সুন্দর, তা হলেই আমি সেটা বুঝতে পারব।

দীপকের এরকম কথা শুনলে নীরা বলত, প্রকৃতি তার নিজের গুণেই সুন্দর। প্রকৃতিকে দেখবার জন্য অন্য কারো দরকার হয় না।

দীপক বলত, আমার হয়। তুমি আছ, তাই আমাব কাছে প্রকৃতি আছে। এই আকাশ গাছপালা সমুদ্র নদী মাঠ সব কিছুই তোমাকে ঘিরে। তুমি ছাড়া আর সবই নীরস। এই রূপের মাঝে তুমি আমার অরূপ। আমার মনে আর মস্তিষ্কে তোমার অধিষ্ঠান। সেই জন্যই আমি প্রকৃতিকে দেখতে পাই।

এরকম বলতে বলতেই সে মুখ বাড়িয়ে নিয়ে আসত মুখের দিকে। কিংবা হাতটা টেনে নিয়ে ভরিয়ে দিত চুমোয় চুমোয়। এমনও হয়েছে, দীপক ওর পাগলা আবেগের বশে মুখ নামিয়ে নিয়ে এসেছে নীরার পায়ের ওপর। বলত, এমন সুন্দর দুটি পা আমি কখনো দেখিনি।

নীরা লজ্জায় পা টেনে নিত। কিন্তু একটা আবেগে আবেশে ওর ভিতরটা যেন কেমন অবশ হয়ে থাকত। ক্ষুধাকাতর শিশুর মত, দীপক দু'হাত যেন সব সময়েই মায়ের বুকে বাড়িয়ে ছিল। গভীর আর তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে যেন সব সময়েই টলমল করত।

দীপক যে কেবল বাইরের প্রকৃতির বুকেই ওকে টেনে নিয়ে ছুটে যেত তা না। শহবেব হোটেল রেস্তোরাঁয় ক্লাবে, সবখানেই ছুটে বেড়াত। নীরা ছুটে বেড়িয়ে দাপাদাপি করার মেয়ে না। অথচ, দীপকের টানে ভেসে যেত, থাকতে পারত না। নিরলস প্রেম ছাড়াও ওর জীবনে সমাজ সংসার পরিবার কাজ, সব কিছুর ভাবনাই ছিল। জগতের বহুতর বিষয়ে ওর মনে নানা তর্ক, নানান কৌতূহল। হৃদয়সর্বস্ব আবেগপ্রবণ মেয়ে ও না, স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকে মেপে

নেওয়া ওর চরিত্রের মধ্যে আছে। প্রেম ছাড়াও জগৎ-সংসারের আরো অনেক বিষয়ে দীপকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করত। দীপকের তাতে নিতান্ত অনীহা। নীরা অনেক দিন বলেছে, দীপক, সংসারে তুমি অচল।

দীপক বলেছে, সেখানে আমি সচল হতে চাই না। আমি কেবল হৃদয়ের বীণায় বাজতে চাই।

নীরার মনে হত, ওসব কথা শুনতে ভাল, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে অর্থহীন। ও বলেছে, হৃদয়ের বীণাটা সংসারকে বাদ দিয়ে এমন কথা তোমাকে কে বলেছে?

দীপক বলেছে, কেউ বলেনি। হৃদয়-বীণাটা যদি সংসারের মধ্যেই থাকে তা হলে সেটার দায়িত্ব তুমিই নিও। কিন্তু আমি যেন বাজতে পারি। আমাকে অচল করে দিও না।

দীপকের কথা শুনে নীরা মনে মনে হেসেছিল। বিদ্রূপ করে নয়। সে হাসির মধ্যে স্নেহ ছিল এবং একটু সুখও ছিল। দীপক সংসারে অচল হলেও নীরার মধ্যেই জেগে থাকতে চেয়েছিল। মনে করেছিল, দীপক এক রকম অসহায় দামাল শিশু। এরকম পুরুষকে মেয়েদের নিজেদের চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দীপক ওর কাছে শিশুর মতই আত্মসমর্পণ করেছিল। সব কিছুর উর্ধ্বে নীরা দীপককে অবিশ্বাস করেনি। তাকে দুর্বলচরিত্র সম্ভোগকাতর একটি যুবক বলে ভাবেনি।

ভাবেনি বলেই, নীরার লক্ষ্যে পড়েনি, মীরার উনিশ বছরের দুরন্ত বসন্তে কবে আগুন লেগেছিল। যে আগুন দীপক লাগিয়েছিল। আবেগ আর উচ্ছ্বাসপ্রবণ মীরা, জীবনটা ওর কাছে ছিল ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গে খেলার মত। মীরার প্রাণের বেগ ছিল উত্তাল। বুদ্ধি বা চিন্তার গভীরতা তেমন ছিল না। হাসিখুশি, নিষ্পাপ, নির্ঝরের মত কলকলানো।

নীরা দেখেছিল, অনেক সময়েই দীপক মীরার সঙ্গে হাসিতে কথায় মেতে আছে। নীরা বাড়িতে না থাকলে ওরা দুজনে একত্র সময় কাটিয়েছে। নীরার মনে কখনো কোন সন্দেহ হয়নি। বরং মনে হয়েছে দুটিই সংসার অনভিজ্ঞ শিশু। শেষের দিকে মাঝে মাঝে নীরাব মুখে চকিতে একটু সংশয়ের ছায়াপাত হয়েছে। তাও মীরার আচরণের জন্য না, দীপকেব আচরণে। নীরার প্রতি দীপকের অমনোযোগিতায়। নীরা বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও যখন দেখত দীপক মীরার কাছ থেকে সরে আসতে চাইছে না, নীরাকে নিয়ে ছুটে বেবিয়ে যাবাব থেকেও মীরাব সঙ্গে গল্পে কথায় মশগুল, তখন ওর মনে ঈষৎ সংশয়ের ছায়াপাত ঘটেছে।

সংশয়েব থেকেও বলা ভাল, মনটা একটু বিষণ্ণ হত। কিন্তু দীপক ওর কাছে এলেই মনেব ছায়া ফুৎকারে উড়ে যেত। বরং নিজেকেই মনে মনে ধিক্কাব দিত। ভাবত, সরলচিত্ত দীপক কোন কিছুই ভেবে চিন্তে করে না। সবটাই তাব ছেলেমানুষি আবেগে ভরা। কখনো কখনো এমনও হয়েছে, দীপক মীরাকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে। নীবার মনে চকিতে একটু বিষণ্ণতার ছায়া খেলে গিয়েছে। দীপক ফিরে এসে নীবাকেই বলেছে তাদের বেড়ানোর গল্প। বলেছে, তোমার বোন মীরা হল একটা প্রবল বন্যা, কল্লোলিনী। বন্যাও বটে। কেবল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক এক সময় ওকে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

নীরা হেসে বলেছে, তোমাদের দুজনে মিলেছে ভাল।

হ্যাঁ, তোমার ভাষায়, আমরা দুজনেই পাগল। কিন্তু দু'রকমের পাগল আমরা। আমার মত পাগলকে সামলাতে তোমার দরকারই বেশি।

নীরা এ সব কথার মধ্যে কখনো সন্দেহের কিছু খুঁজে পায়নি। এমন কি, নীরার সঙ্গে মিলিয়ে যখন মীরার তুলনা করেছে, তখনো নীরার কিছু মনে হয়নি। মীরাকে স্নেহ করে, ভালবাসে, সেটাই

স্বাভাবিক বলে জেনেছে। মীরাকে কে না ভালবাসত। কিন্তু দীপকের প্রমত্ত খেলা, খেলতে খেলতে কোন্ সর্বনাশের খাল কাটছিল, নীরা তা বুঝতে পারেনি। ও যে কাউকেই অবিশ্বাস করেনি। সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা স্বাভাবিক মেলামেশা উচ্ছ্বাস আর আনন্দ বলেই মনে করেছিল।

একেবারে শেষের দিকে, অদৃশ্য রন্ধ্রের ভিতরে সর্বনাশ যখন তার ষোল কলা পূর্ণ করেছে, তখন দীপকের মধ্যে একটু যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। পরিবর্তন মীরার মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। দীপকের যাতায়াত কমে গিয়েছিল। নীরাকে গিয়ে তাকে খুঁজে আনতে হত। তার কথার ফুলঝুরিতে বারুদের মশলা যেন কমে এসেছিল। মীরাকে ঘরের বাইরে কম বেরোতে দেখা যাচ্ছিল। কথা কম শোনা যাচ্ছিল, হাসি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীপককে মীরার কাছে ছুটতে দেখা যায়নি। মীরাকেও দীপকের কাছে আসতে দেখা যায়নি।

নীরার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। কোন কটু সন্দেহে না, একটা জিজ্ঞাসু কৌতূহলে। ও দীপককে জিজ্ঞেস করছিল, মীরার সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেখছি না যে? তোমরা ঝগড়া করেছ নাকি?

দীপক বলছিল, তা একরকম বলতে পারো। আমাকে বোধহয় ওর আর ভাল লাগছে না। মীরা কী বলছে?

ও বলছে ওর শরীর ভাল নেই। বেশির ভাগ সময় ঘরে থাকে। কোন কোন সময় অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে চলে যায়।

মীরা তাই বলেছিল, ওর শরীর ভাল নেই। দেখেও তা-ই মনে হয়েছিল। চোখের কোল বসা, মুখের রঙে সেই উজ্জ্বলতা নেই। শুকনো, অসুস্থতার ছাপ। নীরা জিজ্ঞেস করেছিল, কী অসুখ করেছে তোর?

মীরা বলেছিল, অসুখ কিছু না, শরীরটা ভাল নেই।

সেটাও ডাক্তারকে বলা দরকার।

মীরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, ডাক্তারকে বলার কোন দরকার নেই। এমনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

নীরা আরো জিজ্ঞেস করেছিল, দীপকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি?

মীরা অন্যদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না।

তবে কথা বলিস না যে?

এমনি।

মীরা সরে গিয়েছিল। শেষের কিছুদিন দীপকের কথা জিজ্ঞেস করলে মীরা জবাব এড়িয়ে যেত, সরে যেত। দীপকও হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত। অথচ দীপক যাওয়া আসা ক্রমেই আরো কমিয়ে দিয়েছিল। কোন কটু সন্দেহ না করলেও নীরার মনে অস্বস্তি জমে উঠেছিল। অশান্তি বোধ করছিল। ওদের দুজনের মধ্যে একটা কিছু ঘটেছে, সে বিষয়ে নীরার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কী ঘটেছে, বুঝতে পারেনি। কটু নয়, একটাই যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ ওর মনে জেগেছিল, মীরা আর দীপক কি পরস্পরকে ভালবেসেছে? কথাটা ভাবতে ওর বুকের শিরায় টান পড়েছিল, টনটনিয়ে উঠেছিল। ওদের আচরণ নীরাকে শুধু ভাবিয়ে তোলে নি, মনে মনে কেমন যেন একটা অসম্মান বোধ করেছিল। একজন ওর পরম স্নেহের বোন। আর একজন প্রেমিক। তারা যদি ওর কাছে নিজেদের গোপন করে চলে, মুখ ফুটে কিছু না বলে, তা হলে আত্মসম্মানে লাগে বৈকি। বিশেষ করে ওর মত মেয়ের পক্ষে।

তা-ই একেবারে শেষের কয়েকটা দিন নীরা চুপ করে ছিল। মীরাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। দীপক না এলেও তাকে ডেকে আনতে যায়নি। এলেও জিজ্ঞেস করেনি, কেন সে আসেনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা উদ্বেগ ওকে অস্থির করে তুলছিল। বিশেষ করে, মীরার জন্যই ওর উদ্বেগ বেশি ছিল।

এখন নীরার মনে হয়, কেন ও চুপ করে ছিল। ওর চোখ ওকে এমন করে ফাঁকি দিয়েছিল কেমন করে। কেন ও সব স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কেন এত বিশ্বাস করেছিল। কেন ও মীরাকে চেপে ধরেনি। তা হলে শেষ সর্বনাশকে হয়তো ঠেকানো যেত।

কিন্তু মীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষ খেয়ে নীরার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারেনি। সারল্য আর বিশ্বাস ওর চোখের সামনে একটা পর্দা ঢেকে রেখেছিল। শুধু অবাক লাগে, ঘৃণায় মন পুড়ে যায়, যখন ভাবে, তারপরেও দীপক নীরার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে টেলিফোন করেছিল। নীরা শুধু একটা জবাব দিয়েই রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল, তোমার গলার স্বর শুনতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

দীপকের সঙ্গে সেই ওর শেষ কথা। ভাবতে ভাবতে নীরা ওর টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ল। চুল এলিয়ে পড়ল। টেবিলের কাঁচে নিজের মুখটাকে দেখতে পেল ও। এই মুহূর্তে যেন জীবনের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি প্রবঞ্চনা অপমান আর শোক ওর মুখে নতুন করে ছায়া ফেলেছে। ঝড় নয়, ঝড়ের ছদ্মবেশে কিছু দমকা হাওয়ার বেগ কেমন করে ওর স্তব্ধ কূলে ঢেউ তুলেছিল। হায় নীরার হৃদয়—নীরার প্রেম !···

নীরু !

ব্যগ্র স্বরের ডাক শুনে নীরা টেবিল থেকে মাথা তুলল। ওর ঘরের দরজা ঠেলে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজকিশোর। বললেন, শীগগির এস, রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

বাবা !

নীরা একবার উচ্চারণ করেই ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। ছুটে ব্রজকিশোরের পিছনে পিছনে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মধুসূদনকে ততক্ষণে ঘরের একপাশে ডানলোপিলোর ডিভানের ওপরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন ডিপার্টমেন্টাল প্রধান ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন। তাঁর কোট খুলে নেওয়া হয়েছে। টাই আলগা করে দেওয়া হয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে, চোখ চেয়ে আছেন। মুখের বর্ণ লাল, থমথমে একটা ব্যথার অভিব্যক্তি যেন ফুটে রয়েছে।

ব্রজকিশোর নীরার কাছে মুখ নিয়ে বললেন, বোধহয় অ্যাটাক হয়েছে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। এখুনি এসে পড়বে।

নীরা মধুসূদনের কাছে এগিয়ে গেল। কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে, বাবার একটি হাত ধরল। আর একটা হাত বুকের কাছে আলতো করে ছোঁয়াল। মধুসূদনের গলায় শব্দ হল, হুঁ হুঁ।

নীরা প্রায় চুপি চুপি স্বরে জিজ্ঞেস করল, কষ্ট হচ্ছে বাবা?

মধুসূদন অনেকটা গোঙানো স্বরে বললেন, বুকের কাছে।

নীরা মধুসূদনের ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপা দিল, থাক বাবা, কথা বোলো না।

মধুসূদন নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। ঠোঁট নড়ে উঠল। নীরার বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে এল। জোর করে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইল, যেন কোন শব্দ বেরিয়ে না আসে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চোখের জল আটকে রাখতে চাইল। বলল, কিছু ভেব না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শাড়ির আঁচল তুলে মধুসূদনের চোখের জল মুছিয়ে দিল। অথচ ওর নিজের ভিতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

এ সময়ে ডাক্তার এলেন। এসে এক নজরে মধুসূদনকে দেখেই তাঁর ব্যাগ খুললেন। প্রেসার মাপবার যন্ত্র বের করে কয়েক সেকেণ্ড

নাড়ি দেখেই প্রেসার মাপলেন। একবার ব্রজকিশোরের দিকে দেখলেন। পর পর দুটো ইনজেকশন দিলেন দু'হাতে। সরে গিয়ে ব্রজকিশোরকে বললেন, স্ট্রোক হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান, না বাড়িতে ?

নীরা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, অসুবিধে না হলে বাড়িতেই নিয়ে যেতে চাই।

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, বাড়িতে যত ভাল ব্যবস্থাই থাকুক, হাসপাতালের তুলনায় কিছু অসুবিধে হবেই। ইমারজেন্সি কেস্।

নীরা ব্রজকিশোরের দিকে তাকাল। ব্রজকিশোর বললেন, তা হলে হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া যাক।

ডাক্তার বললেন, আমারও তাই ইচ্ছা। বেশি দেরি করার সময় নেই।

ব্রজকিশোর সরে গিয়ে টেলিফোন রিসিভার তুলে ডায়াল করতে লাগলেন।

নীরা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, কি রকম অবস্থা এখন ?

ডাক্তার বললেন, প্রেসার বেশ হাই। হার্টের অবস্থাও বেশ ভাল মনে হচ্ছে না। হাসপাতালে গিয়েই ই. সি. জি. করাতে হবে, তা হলে হার্টের সঠিক অবস্থাটা বোঝা যাবে। এই কি ওঁর প্রথম স্ট্রোক ?

নীরা বলল, এটা দ্বিতীয় বার।

সকাল বেলা ভাল ভাবেই অফিসে এসেছিলেন ?

নীরার চোখে একটা ছায়া খেলে গেল। বলল, বাইরে থেকে ভালই মনে হয়েছিল। তবে মনের অবস্থা ভাল ছিল না।

ডাক্তার বললেন, কোনরকম ওরিজ অ্যাংজাইটিজ্ অথবা এক্সাইটমেণ্ট ?

না। আমার ছোট বোন তিন বছর আগে আত্মহত্যা করেছিল। আজ তার জন্মদিন ছিল।

ডাক্তার নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। এ সময়ে নীরাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষ এসে পড়লেন। মধুসূদনকে দেখলেন। যে ডাক্তার দেখেছেন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। সব শুনে তিনিও হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বললেন। ব্রজকিশোর জানালেন, পি জি-তেই নিয়ে যাওয়া যাক। আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য মধুসূদনকে যখন গাড়িতে তোলা হল, তখন তিনি প্রায় অচৈতন্য।

সাতদিন পরে মধুসূদন মারা গেলেন। অধিকাংশ সময় অক্সিজেন দিয়েই তাঁকে রাখা হয়েছিল। প্রথম দিকে কয়েকদিন তাঁর কখনো সখনো জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কথা বলতে পারেননি। ঘোলাটে চোখের স্থির তারায় নীরাকে খুঁজেছেন। নীরা কোন সময়েই প্রায় মধুসূদনের কাছ ছেড়ে যায়নি। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বারে বারেই ওর মনে হয়েছে, উনি কিছু বলতে চান। পারেননি, বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল চোখে জল জমে উঠেছিল। শেষের কয়েকদিন তাঁর আর জ্ঞান হয়নি।

নীরা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল, বাবার জ্ঞান আর ফিরে আসবে না। আসেনি। যখন তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল, নীরার প্রথমেই একটা কথা মনে হল, মীরার জন্মদিনের ঠিক সাতদিন পরে বাবা মারা গেলেন। আসলে এই মৃত্যু, সাতদিন আগে, সকালবেলাতেই মধুসূদনের ভিতরে ছায়া ফেলেছিল। সেই সকালে তা বোঝা যায়নি।

মৃতদেহ বাড়িতে আনা হল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিতরা উপস্থিত হল। যে যেখানে খবর পেয়েছে, সকলেই এসেছে। নয়ন

এঞ্জিনিয়ারিং-এর অফিস কারখানা ছুটি হয়ে গিয়েছে। স্বভাবত: প্রচুর লোক সমাগম হল। নীরাও সকলের সঙ্গে শ্মশানে গেল কিন্তু নীরাকে শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে দেখল না কেউ।

নীরাব ভিতরে অখণ্ড শূন্যতা। সেই শূন্যতায় এ মুহূর্তে কোনি হাহাকার জাগল না। চোখের জলে ভাসিয়ে দিল না। কান্নায় ... করল না। অনুভূতি যেন অবশ আর মৃত। এরকম একটা ... মধ্য দিয়েই শ্রাদ্ধাদি মিটে গেল।

কয়েক দিন পর, আস্তে আস্তে নীরার মনে হল, বাবা ক'দিন লোকজনের ভিড়। বড় কলবব। আস্তে আস্তে যেন কিছু বলছি ফিরে পেল ও। দেখল, ওকে সব সময়েই আত্মীয় স্বজন কেউ ঘিরে আছে। তারা সবাই ওকে নানা পরামর্শ ফেলে রাখার দিচ্ছে, স্বার্থ এবং কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করতে চাইছে। ... বাইরে না। দীপকের বাবা ব্যারিস্টার আর এল মুখার্জিও আছেন। নতুন করে মনে পড়ল, বাবার মৃত্যুর দিনও উনি এসেছিলেন। ... নিশ্চয়ই

এই সব ভিড়ের মধ্যে ব্রজকিশোর কাছে থেকেও দূরে ... তোমার রয়েছেন। কণা মেয়েটা প্রায় কাছেই আসতে পায় না। কবে থেকে এরকম ঘটছে, নীরা যেন মনেই করতে পারছে না। এ বাড়িতে যেন এক উৎসব চলছে, অন্য এক নাটক অভিনীত হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে এক ধরনের নিষ্ঠুর উপহাস বলে মনে হল।

এ কথা মনে হতেই, ব্রজকিশোরকে নীরা আলাদা ডেকে নিয়ে গেল মধুসূদনের ঘরে। বলল, বোস কাকা, আমি কোথাও যেতে চাই। অন্তত কিছুদিনের জন্য কোথাও ঘুরে আসতে চাই।

ব্রজকিশোর সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন, সে তো খুব ভাল কথা। আমারও তাই ইচ্ছা, তুমি কোথাও একটু ঘুরে এস। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি আর তোমার কাকীমাও যেতে পারি।

নীরা বলল, তাহলে তো খুব ভাল হয়। বাবা নেই এখন—

নীরা কথাটা শেষ করতে পারল না। হঠাৎ যেন ওর বুকের কাছে কে গেল, এবং মুহূর্তে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝরিয়ে কেঁদে উঠল। নেই, কথাটা ওর মুখ থেকে এই প্রথম উচ্চারিত হল, আর তা-ই ওর শূন্যতার মধ্যে প্রথম ঘোষিত হল, বাবা নেই।

জকিশোর সান্ত্বনা দেবার জন্য একবার ডাকলেন, শোন নীরু—

কান্নার বেগে তা শুনতে পেল না। ব্রজকিশোর চুপ করে মধুসূদনের মৃত্যুর পর নীরাকে তিনি কাঁদতে দেখেননি। ওকে অবকাশ দেওয়া উচিত। যদিও নীরাকে কাঁদতে দেখে তরটাও যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সেটা মধুসূদনের কথা য়েটির কথা ভেবেই। তিনি জানেন, আত্মীয় স্বজন মন করে আপনজন বলতে ওর আর কেউ নেই। উঠতে নীরার অনেক সময় লাগবে।

নকটা সময় পরে নীরার কান্না প্রশমিত হল। ব্রজকিশোর তুমি যা হারিয়েছ, তা কখনো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তবে টুকু বলতে পারি নীরু, আমি সব সময়ে তোমার জন্য আছি। যতদিন বাঁচব, থাকব।

নীরা বলল, সেটাই আমার ভরসা বোস কাকা। আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে নিজের বলে ভাবতে পারছি না।

ব্রজকিশোর বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে মা। তোমার যা বুদ্ধি আর মন আছে, অনেককেই আপন করে নিতে পারবে।

নীরার, দুঃখের মধ্যেও, ঠোঁটের কোণে একটু তিক্ত হাসি দেখা দিল। বলল, কিন্তু বোস কাকা, যে আপন লোকেরা এখন আমাকে ঘিরে আছে, তাদের নিয়ে যে আমি আর থাকতে পারছি না।

ব্রজকিশোর বললেন, আমি এদের কথা বলছি না। তোমার কাজকর্মের মধ্যেই তুমি তাদের খুঁজে পাবে। এখন তুমি বাইরে যেতে

চাও, সেটা ভালই। এসব আপন লোকের হাত থেকে বাঁচা যাবে। কোথায় যেতে চাও বল, আমি দু-একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলছি।

নীরা বলল, সেটা আপনিই ঠিক করুন। একটা কোন নিরিবিলি জায়গায় যেতে পারলেই ভাল। কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়।

ব্রজকিশোর বললেন, গোপালপুরে যাবে? গোপালপুর অন্ সী?

নীরা একটু ভেবে বলল, তাই চলুন।

ব্রজকিশোর একটু কেশে বললেন, সেই ভাল। তবে এ ক'দিন তোমাকে কাজকর্মের কথা কিছু বলিনি। এখনও তেমন কিছু বলছি না, কেবল—

নীরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বোস কাকা, কাজকর্ম ফেলে রাখার ইচ্ছা আমার নেই। সে-রকম জরুরি কাজ কিছু থাকলে বাইরে না হয় না-ই বা গেলাম।

না না, সে-রকম জরুরি কিছু হলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলতাম। বাইরে তোমার যাওয়া দরকার। আর একটা খবর তোমার জানা দরকার, বিজিত জাপান থেকে ফিরে এসেছে।

বিজিত কে?

নীরার প্রশ্নে ব্রজকিশোর যেন একটু অবাক হলেন, এবং তিনি কিছু বলবার আগেই নীরার ভুরু সোজা হয়ে উঠল। বলল, ও, বিজিত মজুমদার?

হ্যাঁ; তার কথাই বলছি। পরশুদিন এসে পৌঁছেছে। রায়ের মৃত্যু সংবাদে খুবই শকড্। এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত আসতে পারেনি। আমাকে খালি বলল, ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন, কিছু মনে নেই। জীবনে এই প্রথম পিতৃশোক কাকে বলে জানতে পারলাম। কথাটা সত্যি। রায়কে বিজিত বাপের মতই মনে করত।

নীরা সহসা কোন কথা বলতে পারল না। বিজিতের কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে লাগল। মনে মনে ভাবল, বিজিত মধুসূদনকে পিতৃতুল্য মনে করত, সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি মধুসূদনও তাকে পুত্রতুল্যই মনে করতেন। এই ব্রজকিশোরকে যেমন নীরার ঠাকুর্দা উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন, বিজিতকেও তেমনি মধুসূদন।- ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পাস করে বিজিত মধুসূদনের কাছে এসেছিল। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। বিজিতের দরকার ছিল চাকরির। তার বাবা মারা গিয়েছিল ছেলেবেলায়। সে একমাত্র সন্তান। মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে থেকে বি. এস-সি পাস করেছিল। মামাদের পক্ষে এঞ্জিনিয়ারিং পড়াবার ক্ষমতা ছিল না। বরং [illegible] কিছু উপার্জন করবে, সেটাই ছিল তাঁদের প্রত্যাশা।

মধুসূদন সব কথা শুনে, সিদ্ধান্ত নিতে বেশি দেরি করেননি। বিজিতকে তাঁর ভাল লেগেছিল, মনে মনে প্রত্যাশা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, ছেলেটি সুযোগ পেলে উন্নতি করতে পারবে। তিনি বিজিতকে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মাসে মাসে তার মাকেও কিছু কিছু সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

নীরা এসব কথা ওর বাবার মুখেই শুনেছে। বিজিত কয়েকবার এ বাড়িতেও এসেছে। বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নীরার মনে হয়েছিল, নিতান্তই মুখচোরা এক বালক। ভালভাবে কথা বলতে পারত না। নীরা বা মীরা, কারো সঙ্গেই বিজিতের কখনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এ বাড়িতে সে ঘন ঘন আসতও না। বিজিত বরাবর একটু দূরে দূরে থাকত, সে দূরত্বটা রয়েই গিয়েছে। অথচ বিজিত বয়সে এমন কিছু বড় না। নীরার সমবয়সী হতে পারে, কিংবা দু-এক বছরের বড় হতে পারে। বয়স অনুপাতে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা কখনও হয়নি।

বিজিত ভাল ভাবেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিল। তখন তাকে

দেখে তেমন মুখচোরা লাজুক বলে মনে হত না। তবে খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হত। তার ব্যবহার থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যেত, সে কোনরকমেই নীরাদের নিজের সমকক্ষ মনে করতে পারত না। এমনিতে সে আসত কম। ফলে একটা দূরত্ব বরাবরের জন্য থেকেই গিয়েছিল। নীরা বা মীরার অনেক ছেলে-বন্ধু ছিল। বিজিত কখনও সে পর্যায়ে আসেনি। অবিশ্যি মালিকের কন্যাদের মত যে নীরাদের দেখেছে, মনে হয়নি। বিজিতের নিজের মধ্যেই স্বাভাবিক সংকোচের ভাব ছিল।

বিজিত এঞ্জিনিয়ারিং পাস কবার পরে ফ্যাক্টরিতে কাজে লেগেছিল। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ঘটকের আণ্ডারে দু-বছর কাজ করার পরে, মধুসূদন লক্ষ্য করেছিলেন, বিজিতের কাজকর্ম চিন্তাধারার মধ্যে একটা নতুনত্বের ঝোঁক আছে। এঞ্জিনীয়ার ঘটকও বিজিতের কাজকর্মে খুব খুশি ছিলেন। মধুসূদন দেখেছিলেন, নতুন কিছু সৃষ্টির প্রতি বিজিতের বিশেষ উৎসাহ। তখনই তিনি বিজিতকে বাইরে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন। সেই বিজিত উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে ফিরে এল। মধুসূদন দেখে যেতে পারলেন না।

নীরা মনে করল, বিজিতের প্রতি বাবার কর্তব্য ওকে পালন করতে হবে। ব্রজকিশোরকে জিজ্ঞেস করল, বিজিতকে আপাতত কোন্ পোস্টে দেওয়া যায় বোস কাকা?

ব্রজকিশোর বললেন, বিজিতের নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট একটা নিতান্ত ফরমাল ব্যাপার। বিজিত নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন স্টাফ। এতকাল ছুটিতে ছিল। রেকর্ডে তাই আছে। কিন্তু এখন তাকে আর পুরোনো পোস্টে রাখা চলে না। সেই জন্যই নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলছিলাম। তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল, বিজিত ফিরে এলে তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ এঞ্জিনিয়ারের পোস্টে দেওয়া হবে।

নীরা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বলল, তাহলে তো আর কথাই নেই। আমি বরং চিন্তা করছিলাম, বিজিতবাবুর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট নিয়ে কোন অশান্তির সৃষ্টি হবে কি না।

ব্রজকিশোর বললেন, কিছুমাত্র না। মিঃ ঘটক ছাড়াও মোটামুটি সকলেই জানে তোমার বাবা বিজিতকে কোন্ পোস্ট দিতে চেয়েছিলেন। তোমার কাজ হচ্ছে বিজিতকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া, একটা সারকুলার জারি করা, আর মিঃ ঘটকের সঙ্গে টেলিফোনে একবার এ বিষয়ে কথা বলা। আর দু-একটা ছোটখাটো কাজ, সেগুলো আমিই ব্যবস্থা করে ফেলব। বিজিতের একটা গাড়ির দরকার হবে। আমাদের ডেভেলপ্‌মেণ্টের বাড়তি গাড়ি গ্যারেজে আছে। সেখান থেকেই একটা গাড়ি আপাতত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ফিরে আসার পরে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

নীরা বলল, তা হলে সার্কুলার আর চিঠি কাল তৈরি করে নিয়ে আসবেন।

হ্যাঁ, সকালের দিকেই সেটা নিয়ে আসব, তুমি সই করে দেবে। বিজিতকে তা হলে তোমার সঙ্গে কাল বিকেলে দেখা করতে বলে দেব। ওর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট চিঠিটাও তখনই দিয়ে দিও!

নীরা জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা বেরোচ্ছি কবে বোস কাকা?

ব্রজকিশোর বললেন, পরশুই আমরা বেরিয়ে যাব। আমি চলি, তোমার কাকিমার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে ফেলি গিয়ে, কোথায় যাব।

ব্রজকিশোর বিদায় নিলেন।

পরের দিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় মধুসূদনের সেক্রেটারী ব্যানার্জী নীরার ঘরে টেলিফোন করে জানালেন, বিজিত এসেছে। তাকে তিনি নিচে অফিস রুমে বসিয়েছেন। নীরা বলল, বসতে বলুন, যাচ্ছি।

নীরা তৈরিই ছিল। বিজিতের আসার সময় আগে থেকেই ঠিক ছিল। নীরা নিচে নেমে বাবার অফিস ঘরে এল। মধুসূদন বাড়িতে যখন কাজকর্ম করতেন, এ ঘরে বসেই করতেন। বাবার মৃত্যুর পরে নীরা এ ঘরে আজ এই প্রথম এল। ঘরে ঢুকে নীরা দেখতে পেল, টেলিফোনের দিকে মুখ করে পিছন ফিরে একজন বসে আছে।

নীরা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে এল। ওর পায়ের শব্দ পেয়েই বিজিত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। নীরা চকিতে একবার বিজিতের দিকে দেখল। বিজিত কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, নমস্কার।

নীরা বাবার চেয়ারে না বসে, পাশের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বসুন।

বিজিত বসল। তারপরে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। তাদের দুজনের মাঝখানে মধুসূদন এসে দাঁড়ালেন। নীরা জানে, মধুসূদনের জন্য বিজিতের মনের কি অবস্থা। সেই চিন্তাটাই যেন বাবার জন্যে ওর মনকে উদ্বেল করে তুলতে লাগল। কিন্তু এ সময়ে ও নিজেকে স্থির রাখতে চাইল। বিজিতের সামনে শোকে ভেঙে পড়তে সংকোচ হল। কাজের কথা বলবার জন্যই বিজিতকে আসতে বলা হয়েছে। তবু ওর আশঙ্কা, বিজিত নিজেই হয়তো বাবার কথা তুলবে। তখন হয়তো নীরা নিজেকে সামলাতে পারবে না।

কিন্তু বিজিত কোন কথাই বলল না। সে চুপ করে বসে আছে। নীরা একবার দেখল। বিজিত মাথা নিচু করে বসে আছে। নীরার মনে হল, বিজিতের অবস্থা ওর মতই। মধুসূদনের প্রসঙ্গ তুলতে চাইছে না। আরও একটু সময় ওরা দুজনেই চুপ করে রইল। যেন এই নীরবতার মধ্যেই মধুসূদনের সহসা মৃত্যু দুজনার আলোচিত হয়ে গেল। অনেক সময় কথার থেকে নীরবতাই মানুষকে অনেক বেশি মুখর করে তোলে।

নীরা জিজ্ঞেস করল, বাইরে কেমন ছিলেন?

বিজিতের গম্ভীর স্বর শোনা গেল, ভালই, কাজকর্মে কেটে গিয়েছে।

নীরা দেখল, বিজিতের ভাব ভঙ্গি প্রায় একরকমই আছে যেন। অথচ চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে আগের থেকে, চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে। সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে, অনেক স্মার্ট লাগছে। ছেলেমানুষি ভাবটা পুরোমাত্রায় বজায় আছে। এখন অবিশ্যি বিজিতের মুখ গম্ভীর। কিন্তু তার কালো চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার সঙ্গে সেখানে হাসি আর কৌতুক যেন মেশামেশি করে আছে। আগে যেমন একটা গোবেচারা ভাব ছিল, সেটা আর নেই।

নীরা জিজ্ঞেস করল, এর মধ্যে কারখানায় গিয়েছিলেন নাকি?

বিজিত বলল, হ্যাঁ, আমি মিঃ ঘটকের সঙ্গে দেখা করেছি। অফিসেও সকলের সঙ্গে কথা বলেছি।

নীরার মনে হল, যদিও বিজিতের উচিত ছিল ওর সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু সেটা বিজিত স্বাভাবিক কারণেই পারেনি। ব্রজকিশোরের কাছে সেকথা ও আগেই শুনেছে। নীরা বলল, বাবার ইচ্ছা ছিল আপনি ফিরে এলে ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফ এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব আপনাকে দেবেন।

নীরা দেখল, বিজিতের মাথা এত নিচু, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। মুহূর্তের মধ্যে নীরার গলার কাছেও যেন কিছু ঠেলে এল। ও বুঝতে পারছে, বিজিত এই মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কথা বলতে পারছে না। দেখে মনে হচ্ছে বিজিতের সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট, শক্ত হয়ে আছে। আবার মধুসূদন ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। নীরা ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে নিজেকে দমন করল। সামনে যে ফাইলটা ছিল সেটা খুলে ধরল চোখের কাছে। একেবারে ওপরেই রয়েছে ওর সই করা বিজিতের নিয়োগপত্র।

মৃত্যুর জতের নিচু গম্ভীর স্বর শোনা গেল, আমাকে দিয়ে উনি যা চেয়েছিলেন তার কিছু দেখে গেলেন না, দেখবেনও না।

নীরা মুখ না তুলেই বলল, সেটা আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য।

কথার শেষে নীরা চোখ তুলে বিজিতের দিকে দেখল। তার চোখ রক্তিম, মুখ থমথমে। সে যেন কিছু বলবে বলে নীরার দিকে তাকিয়েও কিছু বলল না। নীরা আবার বলল, আপনাকে দিয়ে যা চেয়েছিলেন, আপনি তাই করবেন।

বিজিত বলল, সেটাই আমার কর্তব্য।

নীরা ফাইল থেকে নিয়োগপত্রটি বিজিতের দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

বিজিত হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

নীরা বলল, আমি কিছুদিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে অন্যান্য কথা বলা যাবে।

বিজিত চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উদ্যোগ করে বলল, আচ্ছা, আমি তা হলে—

নীরা বলল, বসুন, বসুন। আমি আপনাকে উঠতে বলিনি। আপনাকে খবরটা দিয়ে রাখছিলাম, আগামীকাল আমি বাইরে যাচ্ছি।

বিজিত বসে বলল, মিঃ বোসের কাছে শুনেছি।

ইতিমধ্যে কোন অসুবিধা হলে চালিয়ে নেবেন।

নিশ্চয়ই। অসুবিধা আর কী হতে পারে।

নীরা দেখল, বিজিতের সঙ্গে আপাতত ওর আর কোন কথা নেই। অথচ বসতে বলে চুপ করে থাকা যায় না। বলল, একটু চা খান।

বিজিত বলল, থাক না এখন।

থাকবে কেন, একটু চা তো।

নীরা বেল বাজাল। নিচের অফিস-বয় এল। তাকে চা দিতে বলল। ভাবল, বাবা বেঁচে থাকলে বিজিতের সঙ্গে আজ তাঁর অনেক

কথা হত। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু কটে পক্ষে যেমন সমস্ত ব্যাপারটা অভাবনীয় এবং নতুন, নীরার পক্ষে তাই। বিজিত ভাবেনি মধুসূদনের পরিবর্তে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওকে কথা বলতে হবে। এ পরিস্থিতিকে বিজিত কী ভাবে দেখছে কে জানে। সে যে ভাবেই দেখুক, নীরাকে এই বিজিতকে নিয়েই কাজ করতে হবে। এখনো পর্যন্ত কাউকে নিয়ে নীরাকে কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হয়নি। বিজিতকে নিয়েও পড়তে হবে না, আশা করা যায়।

কিন্তু বিজিতকে তেমন অভিজ্ঞ আর ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হচ্ছে না। সে কী ধরনের কাজকর্ম শিখে এসেছে, পরে তা জানা যাবে। এখন তো তাকে যেন রীতিমত ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। এই প্রথম নীরার মনে হল, বিজিতের শরীরের গঠন লম্বা চওড়া শক্ত হলেও চোখে মুখে যেন একটি মেয়েলি ভাব।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মানুষটা খাঁটি হলেই হল, এবং নীরার মনে হচ্ছে সেদিক দিয়ে বিজিতকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। ও জিজ্ঞেস করল, এখন তো আপনি জাপান থেকে আসছেন?

বিজিত বলল, হ্যাঁ। শেষের এক বছর উনি (মধুসূদন) আমাকে জাপানে কাটিয়ে আসতে বলেছিলেন। জাপানের স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সম্পর্কে আমি যাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি। উনি এখান থেকে ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ইংল্যাণ্ড থেকে আমাকে জাপানে আনিয়েছিলেন। কিন্তু—

বিজিত চুপ করল। নীরা জানে, বাবার কথাই বিজিতের মনে আসছে। বাবার ইচ্ছানুযায়ী যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করে এসেছে, তা যোগ্য এবং ন্যায্য জায়গায় ব্যক্ত করা হল না।

চা এল। বিজিত চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনাকে আমি ওঁর (মধুসূদনের) চিঠিগুলো দেখাতে চাই, যে সব চিঠি তিনি আমাকে

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জাপানেও লিখেছিলেন। সে সব চিঠি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, ভবিষ্যতে ওঁর কী ধরনের পরিকল্পনা ছিল।

বিজিতের এই প্রস্তাবে নীরা যেন বাবাকে জানবার একটা নতুন কূল পেল। মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। বলল, খুবই ভাল হয়। আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়—

বিজিত বলে উঠল, না না, এটা কোন ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা নয়। আমি কিছু বলার থেকে, ওঁর পরিকল্পনা মতই কাজে হাত দিতে চাই। তাতে কেবলমাত্র আপনার অনুমোদন আর সমর্থন আমার দরকার।

বিজিতের কথাবার্তা শুনে এখন তাকে বেশ চতুর আর বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতের কাজের ব্যাপারে পাছে নীরার সঙ্গে তার কোন বিরোধ হয়, সেই জন্যই বাবার চিঠিগুলো ওকে দেখাতে চায়। নীরা বলল, আশা করি, বাবার ইচ্ছামত কাজের ব্যাপারে আমার অনুমোদনের অভাব হবে না।

নীরা কথাটা একটু গম্ভীর মুখে বলল। বিজিত একবার নীরার মুখের দিকে দেখল। বলল, আপনার ওপরেই সব নির্ভর করছে। আপনি ফিরে এলেই চিঠিগুলো আপনাকে দিয়ে দেব।

নীরার মনে হল, বিজিতের কথায় কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে, নীরার সঙ্গে তার বিরোধ হতে পারে, অথচ নীরা ওর বাবার পরিকল্পনা মত ঠিক কাজ করতে পারবে না। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, বাবার পরিকল্পনা মত কাজ হবে না, আপনার মনে কি এরকম কোন সন্দেহ আছে?

বিজিত চকিতে একবার নীরাকে দেখল, চোখাচোখি হল। বিজিত টেবিলে আঙুল ঘষতে ঘষতে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, দেখুন মিস রায়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর যে আংশিক শেয়ার

ডিস্ট্রিবিউট করা আছে, সেই সব শেয়ার হোল্ডারদের পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড আছে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ঘটক আছেন। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ছাড়াও আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মিঃ বোস আছেন। আপনার অনুমোদনের জন্য এঁদের সকলের অনুমোদন আপনাকে আদায় করতে হবে। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর নিয়ম তা-ই, অতীতেও তা-ই হয়েছে। যিনি আসল ব্যক্তি, তিনি আজ আমাদের মাঝখানে নেই। সেই জন্যই বলছি, আপনার ওপরেই সব নির্ভর করেছে।

নীরা তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয়, তাঁদের কাছ থেকে কোন বাধা আসবে।

বিজিত হঠাৎ কোন জবাব দিল না। এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, তাঁরা বাধা দেবেনই এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু সকলেই মধুসূদন রায়ের মত বিচক্ষণ আর সাহসী নন। তাঁর মত সকলেই নতুন অভিযানে নামতে সাহস পায় না। অনেকেই হয়তো দ্বিধা করবেন, ভয় পাবেন। সেই কথাই বলছি।

নীরা গম্ভীর স্থির গলায় বলল, সে দায়িত্ব আমার। বাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবেই।

বিজিতের চোখের তারায় ঝিলিক হেনে গেল। তার মুখ ঝকঝকিয়ে উঠল। স নীরার কথায় আর কোন মন্তব্য করল না। বলল, উনি যত চিঠি লিখেছেন, সব চিঠিতেই বোঝা যেত, ওঁর মনে একটুও শান্তি নেই। কিন্তু কাজের কথায় খুব উৎসাহী ছিলেন।

নীরার চোখের সামনে মধুসূদনের মূর্তি ভেসে উঠল। গত কয়েক বছর বাবার মনের অবস্থা কী ছিল নীরার থেকে বেশি আর কে জানে। ও নিচু স্বরে বলল, এ বাড়ির যে অবস্থা, তাতে মনের অবস্থা ভাল থাকতে পারে না।

বিজিত শুধু বলল, জানি।

নীরা বিজিতের দিকে তাকাল, বিজিতও তাকিয়েছিল। চোখ সরিয়ে নিল। তারপরে বলল, আমি তা হলে চলি ?

নীরা বলল, আসুন।

বিজিত বেরিয়ে গেল। নীরা পিছন থেকে তাকে দেখল। ভাবল, কী জানে বিজিত ? নিশ্চয়ই নীরার আত্মহত্যার কথাই বলতে চেয়েছে। তা ছাড়া আর কি জানে ? দীপকের সঙ্গে নীরার ব্যাপারটাও জানে নাকি।

আশ্চর্যের কী আছে। জানলেও নীরার কিছু যায় আসে না। ওটা একটা অন্ধকার পর্ব, অন্ধকারেই চিরদিন পড়ে থাকবে।

বেড়াতে বেরিয়েও নীরা যেন মনের মধ্যে তেমন শান্তি পেল না। কলকাতা থেকে কাছাকাছির মধ্যে ও একটা নির্জন জায়গায় যেতে চেয়েছিল। নির্জন জায়গাতেই এসেছে। কাকীমা অর্থাৎ ব্রজকিশোরের স্ত্রীর পরামর্শ মত কলকাতা থেকে ওরা সোজা গাড়ি নিয়ে পালামৌ জেলায় এসেছে। এক জায়গায় অনেক দিন না কাটিয়ে বিভিন্ন বাংলোয় দু-একদিন করে কাটিয়ে চলেছে।

ছোটনাগপুরের এই সব পার্বত্য অঞ্চল, অরণ্যের নিবিড় বেষ্টনীতে যেন স্বপ্নের দেশ হয়ে আছে। ছায়ানিবিড় বনে বনে এখন পাতা ঝরছে। অজস্র অনামী ফুলে সেজে আছে বন। যেখানেই যায় সেখানেই পাহাড়ী নদী কল্‌কল করে। ঝরনা বয়ে যায় কুলুকুলু শব্দে। কত রকম পাখি যে চোখে পড়ে, আর কত বিচিত্র তার ডাক। ময়ূর আর বনমোরগেরা এত কাছে ঘুরে বেড়ায় যে মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যায়। কিন্তু অসম্ভব। বিদ্যুৎগতিতে উধাও হয়ে যায়। রাত্রে হরিণ আর ময়ূরের ডাক শোনা যায়। জঙ্গলের মানুষেরা সরল আর উদার।

সবই সুন্দর, বন গভীর নির্জন ও নিবিড়। নীরাও নিবিড় হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু মনটা যেন স্থির হতে চায় না। পিছনে যেন ওর অনেক টান রয়ে গিয়েছে। কলকাতার কথাই বারবার মনে হয়। কলকাতার বাড়ি অফিস কারখানা, এ সবই যেন ওর পিছনে ছায়ার মত লেগে রয়েছে।

কিন্তু আসলে কি তাই? তা না। সব কিছুর থেকেও বেশি, বাবার চিঠিগুলোর কথাই ওর বারে বারে মনে পড়ে যায়। বিজিতকে ওর হিংসা হয়। বাবার সঙ্গে তার অনেক চিঠি আদান প্রদান হয়েছে।

নীরা যদি বাইরে থাকত, তাহলে ও বাবার কাছ থেকে অনেক চিঠি পেতে পারত। বাবাকে আরো বেশি জানতে চিনতে পারত। সেদিক থেকে বিজিত ভাগ্যবান। বাবাকে হয়তো সে নীরার থেকেও বেশি চেনে। নীরার একটা অভিমান আর ক্ষোভ জমে ওঠে। যদিও তার কোন অর্থ নেই।

এই বনে বনে নির্জনে বেড়াতে ভাল না লাগবার কারণ তাই। বাবার চিঠিগুলো যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কেবলই মনে হচ্ছে, ওর এখন বেড়াবার সময় নয়, কাজ করার সময়। শেষ পর্যন্ত মাত্র বারো দিন বেড়াবার পরে নীরা ব্রজকিশোরকে জানাল, ও এবার কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। ব্রজকিশোর এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক হলেন। ভেবেছিলেন, দু-এক দিনের মধ্যেই পূর্বঘাট পর্বতমালার আরণ্যক অঞ্চলের দিকে যাত্রা করবেন। কম করে এক মাস ঘোরা হবে।

ব্রজকিশোর জানতে চাইলেন, তোমার শরীর খারাপ করছে না তো?

নীরা বলল, না, শরীর ঠিকই আছে। কিন্তু এভাবে বেড়াতে ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে কাজের মধ্যে থাকলেই ভাল থাকব।

কাকীমা বললেন, কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না নীরু। সারা জীবনই তো কাজ করবে। এখন একটু বেড়িয়ে যাও।

নীরা বলল, না কাকীমা। মনের শান্তির জন্যই তো আসা। আমি যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। তা ছাড়া এতদিনে আমাদের বাড়িও নিশ্চয় ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার ফিরেই যাই।

নীরার জন্যই বেরনো হয়েছিল। নীরাই যখন ফিরতে চাইছে, আপত্তির কিছু থাকল না। ব্রজকিশোর সবাইকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

নীরা রাত্রে কলকাতায় ফিরল। বাড়িতে যা আশা করেছিল তাই হয়েছে। ওকে না পেয়ে সকলেই প্রায় চলে গিয়েছে। পরদিন সকালেই নীরা অফিসে গেল। বাবার মৃত্যুর পরে এই প্রথম অফিসে এল। নীরা অফিসে এসেই কারখানায় ফোন করে বিজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করল। বলল, আপনার অসুবিধা না হলে, আজই বাবার চিঠিগুলো দেখতে চাই।

ওপার থেকে বিজিতের জবাব এল, এখনই যদি চান, তা হলে আমি বাড়ি থেকে চিঠিগুলো এনে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।

নীরা বলল, তাই দিন।

নীরা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রায় একমাসের কাজ জমে আছে। নিজের কাজগুলোই ওকে আগে শেষ করতে হবে। কেবল নিজের নয়, মধুসূদনের কাজও এখন ওর মাথায়। তাঁর ফাইল পত্র কোথায় কী রেখে গিয়েছেন, সেগুলোও ওকে দেখতে হবে। একটা প্রধান কাজ অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট। ওটার সবটাই মধুসূদন দেখা শোনা করতেন।

লাঞ্চের আগেই বিজিত এল। ছোট একটি মরক্কো লেদার কেস্ সে নীরার হাতে তুলে দিল। বলল, বছর পাঁচেকের মধ্যে চল্লিশটা চিঠি উনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। সবই এর মধ্যে আছে।

মধুসূদনের চিঠির গুচ্ছ এত যত্ন করে রাখতে দেখে নীরা মনে মনে খুশি হল। ও নতুন করে বুঝতে পারল, বাবার প্রতি বিজিত কতখানি অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল। বাবাও অবিশ্যি তাকে ভালবাসতেন। এত চিঠি বাবা তাঁর সন্তানদের লেখেননি। লেখার দরকার হয়নি।

বিজিত আবার বলল, চিঠিগুলো আপনার পড়া হয়ে গেলেই আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

নীরা বলল, আমি আপনাকে দু-একদিনের মধ্যেই ডাকব। বলতে গেলে, এই চিঠিগুলো দেখবার জন্যই নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে পারলাম না।

বিজিত বলল, আমিও তাই ভাবছিলাম, অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন।

নীরা চামড়ার কেসটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। বিজিত উঠে দাঁড়াল। বলল, চিঠিগুলো একান্তই ব্যক্তিগত। আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।

নীরার মুখ মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে উঠল। একটা রাগের হল্কা অনুভব করল। বিজিতের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কিছু বলবে মনে করেও চুপ করে গেল। একটু পরে গম্ভীর গলায় বলল, আপনার চিঠি আপনি সবই ফেরত পাবেন। কাজের জন্যই চিঠিগুলো দেখার দরকার।

বিজিত ঘাড় নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই। ভুল বুঝবেন না। চিঠিগুলো আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান সম্পদের মত, সেইজন্যই বলছিলাম।

চিঠিগুলো বিজিতের কাছে কেন, নীরার কাছেও যথেষ্ট মূল্যবান। তবু চিঠিগুলো তো ওর বাবারই লেখা। তবে অন্য একজনকে লেখা।

আর সেজন্যই এ কথা ওকে শুনতে হচ্ছে। ওর মুখে একটা কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। বলল, আপনার মূল্যবান সম্পদ আপনারই থাকবে।

বিজিত চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, আমি যাচ্ছি। যখনই ডেকে পাঠাবেন আমি চলে আসব।

নীরা জিজ্ঞেস করল, কাজকর্ম শুরু করতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

বিজিত বলল, না। কোথাও কোন পরিবর্তনই তো হয়নি। যেমন দেখে গিয়েছিলাম সব ঠিক তেমনিই আছে। কারখানায় ঢুকে মনে হল, আমি যেন দু-এক দিনের জন্য কোথাও গিয়েছিলাম।

বিজিতের কথার মধ্যে বিশেষ একটা অর্থ আছে। তার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে কারখানার পরিবর্তন আশা করেছিল।

নীরা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনি হয়তো পরিবর্তন আশা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

নীরার কথার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। কিন্তু বিজিতকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, বাবার পক্ষে নতুন করে কিছু করা সম্ভব হয় নি। বোধহয় আপনার জন্যই বাবা অপেক্ষা করছিলেন।

বিজিত কিছু বলল না। চেয়ার থেকে উঠে ছোট করে বলল, যাচ্ছি।

বিজিতের যাবার পথে তাকিয়ে নীরা হাসল। বিজিতের মনে মনে অনেক আশা আর উদ্দীপনা। তার কথা থেকেই তো বোঝা যায়। সে কারখানার পরিবর্তন দেখতে চায়। নতুন পরিকল্পনাকে রূপায়ণের স্বপ্ন তার মনে। বিজিতকে দেখলে মনে হয়, জীবনের কোন জটিল আবর্তে এখনো তাকে পড়তে হয়নি। কোন অন্ধকারের স্পর্শ লাগেনি। মন তাজা, কাজের উন্মাদনায় মেতে আছে। ভবিষ্যতের কাছে তার অনেক আশ্বাস।

নীরা চামড়ার কেসটার দিকে তাকাল। একটা গভীর ব্যথা আর

আনন্দের অনুভূতিতে কেসটা দু'হাতে তুলে নিল। কপালে ছোঁয়াল। তারপর কেস্‌টা খুলে বুভুক্ষুর মত চিঠিগুলো দেখল। দেখে আবার কেসটার মুখ বন্ধ করল। অফিসের কাজকর্মের মধ্যে এ চিঠি পড়া যাবে না। রাত্রে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে একে একে সব চিঠিগুলো পড়তে হবে।

নীরা রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে মধুসূদনের সমস্ত চিঠি খুলে নিয়ে বসল। ইংবেজিতে লেখা। সবই হাতে লেখা, তাব মানে মধুসূদন চিঠিগুলো নিজের হাতে খামে বন্ধ করে পোস্ট করতে দিতেন।

প্রথমদিকের চিঠিগুলো নিতান্ত খবরাখবর নেওয়াব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদেশে বিজিতের কী সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে, কী ভাবে তাব চলা উচিত সে বিষয়ে উপদেশ। একটা সময়ে বেশ কিছুদিন চিঠি লেখেননি। তারপরে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে মীরার আত্ম-হত্যার সংবাদ জানিয়েছেন। ঘটনাটাকে তিনি আচমকা সাপের ছোবল খাওয়ার মত বর্ণনা করেছেন। কিছু ব্যক্ত না করেও জানিয়েছেন, মীরা সমাজের একটা পাপের এবং ভুলের শিকার। এর জন্য ক্রোধ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে করার কিছু নেই। লিখেছেন, তাঁকে এই বিষক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে হবে। তার-পরের চিঠিগুলোতেই শুরু হয়েছে নতুন পরিকল্পনার কথা। প্রত্যেকটা চিঠিতেই বাবার মানসিক অশান্তি এবং বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাজের কথাই বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে, এবং নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে, তিনি যে বিজিতের ওপরেই নির্ভর করছেন, সে কথাও অনেক-বার লিখেছেন।

কোন চিঠিতে লিখেছেন, বিজিত সেখানে যে অভিজ্ঞতা, শিক্ষালাভ

করছে, সে সবই যেন সে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ভাবতে পারে। কেননা, মনে রাখতে হবে, এদেশেই তার পবিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে।

পরিকল্পনার প্রধান এবং মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বৈদ্যুতিক ভারি যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি নতুন কারখানা তৈরী করা। এ-রকম কারখানা তৈরী হওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে কথাও অনেক আলোচিত হয়েছে, এবং বিজিতের সঙ্গে মধুসূদন একমত হতে পেরেছেন। চিঠিগুলোর মধ্যে দুজনের তর্ক বিতর্কেরও অনেক ছাপ রয়েছে। এক জায়গায় মধুসূদন লিখেছেন, বিজিত সমস্ত ব্যাপারটা দূর থেকে দেখছে, একটা উন্নত দেশের কাজ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছে। ফিরে কাজে হাত দিতে গেলে বাস্তবের চেহারা অনেক বদলে যাবে। কখনো লিখেছেন, বিজিতেব ধারণার সঙ্গে তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছে।

ব্যাঙ্কের সাহায্য কতখানি পাওয়া যাবে, সরকারী সাহায্য মিলতে পারে কি না, সে সব বিষয়ও আলোচনা হয়েছে। একটা চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন, বিজিতের চিঠি পড়ে তিনি যেন চোখের সামনে বৈদ্যুতিক ভাবি যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু বিজিত ফিরে না এলে কিছুই হবে না। লিখেছেন, তিনি কারোর সঙ্গেই এখনো নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলেননি। বিজিত ফিরে এলে তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলে সকলের সঙ্গে মিটিং করবেন। তবে এটাই তাঁর স্বপ্ন এবং সিদ্ধান্ত।

একটা চিঠিতে লিখেছেন, চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ঘটক যথেষ্ট কুশলী এবং কর্মঠ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সেকালের। বিজিতকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে। জানিয়েছেন, তিনি প্রতিদিনই নতুন পরিকল্পনা কী ভাবে কার্যকরী করা হবে. সে বিষয়ে একটা কার্যক্রম এবং পদ্ধতি নোট করছেন। বিজিত ফিরে এলে সে সবই তিনি তার হাতে তুলে দেবেন।

যত পড়তে লাগল নীরা ততই অবাক হল। এসব বিষয়ে কোনদিন কথা হয়নি। অথচ এত ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাকেই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁর আর বিজিতের মধ্যে।

নীরা লজ্জিত কৌতূহলে দেখল, মধুসূদন একটা চিঠিতে ওর কথাও উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, বিজিত ফিরে এসে একজন নতুন ডিরেক্টরের দেখা পাবে। সে একজন মহিলা, এবং গর্বের বিষয় মহিলাটি তাঁরই কন্যা নীরা। এ জায়গাটা পড়তে গিয়ে নীরা চোখের জল রোধ করতে পারল না।

শেষের দিকে একটা চিঠির কিছু লাইন নীরার বুকের মধ্যে বিঁধে রইল। মানুষ সকলেই অনিশ্চিত আয়ু নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে। আমিও তাই এসেছি। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, আর হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। তবে মৃত্যু নিশ্চয় এতটা নির্দয় হবে না যে, তুমি ফিরে আসার পরে, কাজটা শেষ করে যেতে পারব না। মধুসূদন কেন লিখেছিলেন একথা। বাহ্যত তাঁর কোন অসুখ-বিসুখই ছিল না। নিয়মিত কাজকর্ম করছিলেন। করতে করতে সহসা অসুস্থ হয়ে মারা যান। বাবা কি বিশেষ কিছু অনুভব করেছিলেন? ভিতরে ভিতরে কিছু টের পেয়েছিলেন? হয়তো তাই। একজন আগন্তুকের ছায়া হয়তো দেখেছিলেন। যার নাম মৃত্যু।

চিঠি পড়া শেষ করে, নীরা ঘড়িতে দেখল, তিনটে বেজে গিয়েছে। তথাপি আলো নিভিয়ে শুতে গিয়ে ঘুম এল না। মধুসূদনের চিঠির হস্তাক্ষর চোখের সামনে জেগে রইল, আর তাঁর গলার স্বরে যেন শোনা যেতে লাগল পরিকল্পনার বিষয়।

নীরার ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। কণা চা নিয়ে এসে অঘোরে ঘুমোতে দেখে আর ডাকেনি। ওর আজ নতুন ব্যস্ততা। প্রথমেই

মনে হল, বাবার চিঠিগুলো আগে ব্রজকিশোরকে দেখানো দরকার। তিনি আসবেন একটু পরেই। নীরা তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরী হয়ে নিল। খাবার ঘরে গিযে দেখল, ব্রজকিশোর ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন, সংবাদপত্র পডছেন। ডাকলেন, এস মা। আমি এসে পড়েছি।

নীরা বসে বলল, আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। বোস কাকা, আপনাব সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে।

ব্রজকিশোব জিজ্ঞাসু চোখে নীরাব দিকে তাকালেন। নীরা বলল, জরুরী মানে আব কিছু না, আপনাকে আজ সারাদিন বসে কতকগুলো চিঠি পড়তে হবে। আমি কাল রাত তিনটে অবধি পড়েছি।

কার চিঠি?

বাবাব। প্রায চল্লিশটা চিঠি বাবা বিজিতবাবুকে লিখেছিলেন। বিজিতবাবু আমাকে সব চিঠিগুলোই পড়তে দিয়েছিলেন। চিঠিগুলো আপনার পড়া দবকাব। আমার মুখ থেকে শুনলে কিছু হবে না।

ব্রজকিশোবের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। জিজ্ঞেস করলেন, কোন বিপদ আপদের ব্যাপাব নাকি?

নীরা মাথা নেড়ে বলল, না না, তা নয়। বাবার ভবিষ্যৎ প্ল্যান প্রোগ্রাম কী ছিল, কী কবতে চেয়েছিলেন, সে সব কথা জানা যাবে। বিজিতবাবু ফিরে এলে বাবা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কিন্তু সে সময় আব পেলেন না। আপনি পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

ব্রজকিশোব এবার উৎসাহিত হলেন। বললেন, নিশ্চয়ই পড়ব। বিজিত এটা খুব ভাল কাজ করেছে যে, চিঠিগুলো তোমাকে দিয়েছে।

নীরা বলল, বিজিতবাবু প্রথমদিনই আমাকে চিঠিব কথা বলেছিলেন। গতকাল আমাকে দিয়েছেন। বোস কাকা, আমার মনে হয়, আমাদের সামনে অনেক কাজ।

খাবার টেবিলে খেতে খেতেই কথাবার্তা হল। অফিসে গিয়ে

নীরা চিঠিগুলো ব্রজকিশোরকে দিল। নিজের ঘরে বসে কয়েকটা কাজ সেরেই ও. গেল মধুসূদনের ঘরে। নতুন পরিকল্পনার বিষয়ে মধুসূদন অনেক কথা লিখেছিলেন। চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথায় সেই কাগজ-পত্র আছে কে জানে। সেই লেখা খুঁজে পাওয়া দরকার।

ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে চারটে বড় বড় স্টিলের আলমারি। টেবিলের ডেস্ক। আলমারীগুলো সম্পর্কে সন্দেহ হয়, ওখানে হয়তো থাকবে না। ওখানে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর অনেক পুরনো আর নতুন ফাইল-পত্র ভরতি হয়ে আছে। টেবিলের ড্রয়ারগুলো আগে দেখা দরকার। নীরা চাবির গোছা নিয়ে প্রত্যেকটি ড্রয়ার খুলে খুলে দেখল। অনেক কাগজ, অনেক ফাইল আছে। কিন্তু সেই বিশেষ বিষয়ের কাগজগত্র কোথাও নেই।

প্রায় হতাশ হবার মুখে একটা বড় সাইজের নোটবুক চোখে পড়ল। আগের থেকেই দেখেছে, কিন্তু নোটবুকটাকে আমল দেয়নি। এবার সেটা টেনে নিল। পাতা উল্টোতে উল্টোতে নোটবুকের মাঝখানে গিয়ে পাওয়া গেল সেই ঈপ্সিত লেখার সন্ধান। ওপরেই লেখা আছে, নিউ প্রজেকশন, হেভি ইলেকট্রিক্যাল পার্টস অ্যাণ্ড মেসিনারিজ।

নীরা পাতার পর পাতা উল্টে গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে অনেক কথা লেখা। কী ভাবে নতুন প্রজেকশন শুরু হবে, তার বিস্তৃত বিবরণ। নতুন প্রজেকশন যে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এরই একটি নতুন প্রচেষ্টা, সে কথা বলা আছে। টাকা কী ভাবে সংগ্রহ হবে, তার খুঁটিনাটি পন্থার উল্লেখ রয়েছে। এমন কি কারখানার সাইট কোথায় হবে; সে বিষয়েও মতামত দেওয়া আছে। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, পাঁচ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে হলে ভাল হয়, একথা লেখা রয়েছে।

তাই ভেবেছি বোস কাকা। এবার আপনি মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করুন।

তিন দিনের নোটিশে অ্যাডভাইসরি বোর্ডের মিটিং ডাকা হল। তার মধ্যে বিজিতের সঙ্গে নীরা আর ব্রজকিশোরের কয়েক দফা আলোচনা হল। বিজিত মধুসূদনকে কী কী পরামর্শ দিয়েছিল সে-সব কথা বলল।

কিন্তু প্রথম দিনের মিটিং-এ কিছুই সাব্যস্ত করা গেল না। অ্যাডভাইসরি বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য হঠাৎ কোন মতামত দিয়ে উঠতে পারলেন না। চীফ এঞ্জিনিয়র ঘটক সমস্ত ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। অন্য তিনজন সদস্যেরও প্রায় তাই মতামত। সকলেই মধুসূদনের চিঠি এবং নোটবুকের বিবরণ দেখতে চাইলেন। এই মিটিং-এ বিজিত উপস্থিত ছিল। সে কিন্তু কোন কথা বলেনি।

সাতদিন সময় নেওয়া হল। স্থির হল ইতিমধ্যে সবাই মধুসূদনের চিঠি আর নোটবুক পড়ে নেবেন।

কিন্তু নীরা সাতদিন স্থির হয়ে থাকতে পারল না। যদিও ওর মতামতটাই সব থেকে বড়, তথাপি সকলেই যাতে একমত হতে পারে সেটাই দরকার। ব্রজকিশোরের সঙ্গে ও ঘন ঘন বসল, কথা বলল। বুঝতে পারল, ফাইনান্সের প্রশ্নটাই সব থেকে বিতর্কের সৃষ্টি করবে। মধুসূদন দু'রকম ব্যবস্থার কথা লিখে রেখে গিয়েছেন। ফাইনান্স কর্পোরেশন এবং ব্যাঙ্ক।

নীরা এই সাতদিনের মধ্যে একদিন বিজিতকেও ডাকল। বিজিতের কথাবার্তা অন্যরকম. একটু রোখা রোখা। তার বক্তব্য, নীরা একলাই সব কিছু করতে পারে। অ্যাডভাইসরি বোর্ডের অনুমতির জন্য ওকে অপেক্ষা না করলেও হবে। নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড বোর্ডকে একটা নীতি হিসাবে রেখেছে। সদস্যদের মধ্যে যার

শেয়ারহোল্ডার, তাদের শেয়ার নগণ্য। সুপ্রীম পাওয়ার শ্রীমতী নীরা রায়ের। তিনি যা করবেন তাই হবে।

বিজিত একেবারে মিথ্যা কথা বলেনি। কিন্তু তার কথার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই মানতে রাজী না। নীরা সে ভাবে কাজ শেখেনি। ওর ধৈর্য অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত না দেখে ও হঠাৎ কিছু করবে না।

বিজিত আরো বলল, অ্যাকাউন্টেন্ট, অডিটর, এঁদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন। মিঃ বোস তো আছেনই। এঁরা ঠিক থাকলে সব ঠিক আছে।

একটু থেমে, কী ভেবে বিজিত আবার বলল, অবিশ্যি এসব কথা আমার বলা চলে না। আমি অন্য কাজের লোক। যেদিন থেকে অনুমতি পাব সেদিন থেকেই আমি শুরু করব।

নীরা বলল, আগামী মিটিং-এ আপনি কিছু বলুন। এমন ভাবে বলুন যাতে সবাই কন্‌ভিন্সড্ হতে পারেন।

বিজিত হাসল একটু, বলল, আপনি বললে নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু মিঃ ঘটক আমাকে ইতিমধ্যে কয়েকবারই শুনিয়েছেন, এরকম একটা হেভি প্রজেক্ট একটা' বাতুলতা মাত্র। এ কিছুতেই হতে পারে না।

নীরা বলল, মিঃ ঘটকের বয়স হয়েছে, ওঁকে আমরা খাটাতে চাই না।

বিজিত একবার নীরার মুখের দিকে দেখল। বলল, এরকম অনেককেই হয়তো আপনাকে রেহাই দিতে হবে।

নীরার গলা নিচু, স্বর দৃঢ়, যাঁরা রেহাই চান, তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে।

বিজিত বলল, ঠিক আছে, আপনি পারমিশন দিলে মিটিং-এ আমি বলব।

বলেই সে হাতের ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, ওহ্, দেরি হয়ে গেল। আমি এবার উঠব।

নীরা জিজ্ঞেস করল, কারখানা যাবেন তো?

বিজিত বলল, না, আমি একটু বম্বে রোডের দিকে যাব। মানে, পাঁচ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে, পঞ্চাশ মাইল ঘুরে আসব।

নীরার খেয়াল হল, মধুসূদন নতুন কারখানার জায়গা হিসাবে এই রাস্তার কথাই লিখে রেখে গিয়েছেন। নীরা কব্জি উল্টে হাতের ঘড়ি দেখল। বেলা সাড়ে তিনটে। অবিশ্যি এই কয়েকদিন আগে বেড়িয়ে ফেরবার সময় ও সেই রাস্তা দিয়েই এসেছে। তবু হঠাৎ ওর মনে হল, বিজিতের সঙ্গে ও যাবে। বলল, আমি আপনার সঙ্গে গেলে আপনার অসুবিধা হবে?

বিজিত অবাক হয়ে বলল, আপনি যাবেন!

অসুবিধা আছে কিছু?

আমার কিছু নেই। ফিরতে দেরি হয়ে যেতে পারে। আপনি সারাদিন অফিস করেছেন, তারপরে এতটা রাস্তা।

কিছু হবে না। আপনি কি নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাবেন?

হ্যাঁ।

নীরা একমুহূর্ত ভাবল। বলল, আমার গাড়িতে গেলে অবিশ্যি ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত।

বিজিত বলল, সেটা দেখুন, তবে আমি নিজে চালিয়ে যেতেই ভালবাসি।

নীরা রাজী হল, তাই চলুন। এক মিনিট, আমি দুটো টেলিফোন করে নিই। বলে একটা ফোন করল ব্রজকিশোরকে। আর একটা বাড়িতে, কণাকে। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

নীচে এসে বিজিত গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরল নীরার জন্য।

নীরা বলল, আমি সামনেই বসব। বলে ও নিজেই দরজা খুলে বসল।

বিজিত অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে বসল। গাড়ি স্টার্ট করল।

কয়েক মিনিট পরেই নীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কলকাতার রাস্তায় এত স্পীডে গাড়িতে চড়তে ও অভ্যস্ত না। ও না বলে পারল না, এত স্পীডে চালাবেন না, আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

বিজিত আচমকা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল, ওহ্, আয়াম স্যরি।

নীরা বলল, আপনি কি সব সময়ে এরকম স্পীডে চালান নাকি?

বিজিত একটু কুণ্ঠিত হেসে বলল, হ্যাঁ, তাই তো চালাই।

নীরা বলল, খুব অন্যায় করেন। যে কোন মুহূর্তে অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে। এর মধ্যেই আপনি একবার ট্রাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছেন।

বিজিত বলল, তখন অন্যদিকে গাড়ি ছিল না।

তাই বলে চালিয়ে দেবেন? পুলিশও তো আছে, নম্বর নিয়ে নিতে পারে।

পুলিশ ছিল না, দেখেছি।

নীরা বললে, ও, সেটাও দেখে নিয়েছিলেন!

কথাটা গম্ভীর ভাবে বললেও, নীরার হাসিই পাচ্ছিল। মনে মনে না বলে পারল না, আচ্ছা ছেলেমানুষ তো! ইংল্যাণ্ড জাপান ঘোরা একজন যুবক, নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর চীফ এঞ্জিনিয়র, সে কি না পুলিশ নেই দেখে অবলীলায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছে! তাও তার পাশে বসে আছে কোম্পানীর ডিরেক্টর। আর এই লোকের ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের এক বিরাট কর্মকাণ্ড। হাসি পেলেও নীরা একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না। বিজিত নিতান্ত অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নয় তো?

বিজিত হাওড়ার ব্রিজ পার হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি ভাল গতিতেই চলল। তারপরে তাকে প্রতি পদে পদেই বাধা পেতে হল। রাস্তা খারাপ, মাঝখানে ট্রাম লাইন এবং সংকীর্ণ। নীরার অস্বস্তি হচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করল, বিদেশেও কি ও-রকম স্পীডে গাড়ি চালাতেন নাকি ?

বিজিত একটু হাসল। বলল, হু'বার ফাইন দিয়েছি।

চমৎকার! নীরার আবার হাসি পেল মনে মনে। কিন্তু গম্ভীর-ভাবে বলল, সব সময়েই একটু সময় হাতে রেখে কাজে বেরোবেন, তা হলে তাড়াতাড়ি চালাবার দরকার হবে না। অভ্যাসটা বিপজ্জনক।

একটা ট্রামকার ওভারটেক করার পরে বিজিত জবাব দিল, আসলে আমি স্পীডের ব্যাপারটা লক্ষ্যই করিনি।

নীরা বলল, কী করে করবেন, আপনি যে ওতেই অভ্যস্ত। কিন্তু অভ্যাসটা বদলানো দরকার। আপনার অনেক রেসপনসিবিলিটি আছে।

গার্ডেনরীচ সাইডিং-এর কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করাতে হল। গেট বন্ধ, বিরাট লাইন পড়েছে। হাওয়া থাকলেও নীরার মুখে রোদ এসে পড়ছে। বিজিতের মুখে রোদ পড়েনি। কিন্তু সেও দরদর করে ঘামতে আরম্ভ করেছে। বিজিত ওর পাশের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, আপনি এপাশে এসে বসুন, রোদ লাগবে না। আমি একটু নেমে দাঁড়াই।

সে নেমে গেল। নীরা ড্রাইভারের সীটের দিকে সরে গেল। এখন আর ওর মুখে রোদ লাগছে না। স্টিয়ারিং-এর দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, ও অনেক কাল নিজের হাতে গাড়ি ড্রাইভ করেনি। কিন্তু বিজিত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল ? বাইরে ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল না, বাঁদিকে তাকিয়ে দেখল, বিজিত দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। দৃষ্টি লেভেল ক্রশিংয়ের দিকে। সে বোধহয় জানে না নীরা তাকে দেখতে পাচ্ছে।

নীরার হঠাৎ মনে হল, সেই পুরনো বিজিত আর এই বিজিতে অনেক তফাৎ হয়ে গিয়েছে। তখন কি সিগারেট খেত ? কখনো দেখা

যায়নি। এখন তাকে বেশ পাকা ধূমপায়ী বলে' মনে হচ্ছে। নীরা না থাকলে হয়তো অনেক আগেই সিগারেট ধরাত। ডিরেক্টরের সম্মানে পারেনি। অথবা, সত্ত বিলাত ঘুরে এসেছে, মহিলার পাশে বসে সিগারেট খেতে ভদ্রতায় বেধেছে। তবে নীরাকে ছায়া দেবার জন্য যে বিজিত নেমে গিয়েছে, এতে তার বুদ্ধি আর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নীরা দেখল, বিজিতের শার্টের বুক খোলা, চওড়া রক্তাভ বুকে হাওয়া লাগাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে সিগারেট, মুখে বিরক্তি। লেভেল ক্রশিং-এর দিকেই তাকিয়ে আছে। নীরা ভাবল, শুধু ধূমপানের ওপর দিয়েই চলছে, না কি শ্রীমান বিলেত থেকে সুধাপানেও পোক্ত হয়ে এসেছে? তাছাড়া এতগুলো বছর বাইরে কাটিয়ে এল নিতান্ত কি নির্ভেজাল ভাবেই? বিদেশে বিদেশিনী এবং দেশিনী সবই ছিল। কোথাও কি মনের লেন-দেন ঘটেনি? এ ব্যাপারে ছেলেদের বিশ্বাস নেই।

নীরা হঠাৎ দেখল বিজিত এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির সারি নড়তে আরম্ভ করেছে। ও তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় সরে গেল। বিজিত গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

নীরা তখন নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জা বোধ করছে। বিজিতকে নিয়ে এত কথা ভাববার ওর কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ কত কথাই ভেবে বসল এইটুকু সময়ের মধ্যে। ও গম্ভীর ভাবে চুপ করে বসে রইল।

আন্দুল পেরোবার পরেই গাড়ির গতি আবার বাড়তে আরম্ভ করল। রাস্তা যতই ফাঁকা আর চওড়া হতে লাগল স্পীডোমিটারের কাঁটা ততই ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকল। কিন্তু বিজিতের সেদিকে কোন খেয়াল আছে বলে মনে হল না। নীরা যে তার পাশে বসে আছে সে কথাটাও বোধহয় মনে নেই। নীরা ওর চুলের গোছা সামলে রাখতে

পারছে না। গালে কপালে চোখের ওপর এসে পড়ছে, বারে বারেই সরিয়ে দিচ্ছে। বিজিতের ভুরু পর্যন্ত গোটা কপাল এলোমেলো চুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, তার মুখটাই বদলে গিয়েছে।

স্পীডোমিটারের কাঁটা ক্রমে একশো কুড়ি স্পর্শ করল। ছোট পাতলা ফিয়াট গাড়ি থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে চাকার তলায় একটা সামান্য পাথর থাকলেও গাড়িটা ছিটকে আর এক দিকে আছড়ে পড়বে। নীরার যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আর একটু সময় এরকম চলতে থাকলে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অথচ বিজিতের একটুও লক্ষ্য নেই। ও প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, আস্তে চালান।

বিজিত সঙ্গে সঙ্গে গতি কমিয়ে বলল, ওহ্, সরি।

প্রায় ষাটের কাছে কাঁটা নেমে এল। নীরা বিজিতের দিকে ঘুরে তাকাল, একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? আপনি কি বিশেষ কোন কাজে বিশেষ কোথাও যাচ্ছেন?

বিজিত একটু সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে বলল, না তো!

তবে এত জোরে চালাবার মানে কী? আমি কী বলেছিলাম তখন?

বিজিত এবার সত্যি অপ্রস্তুত আর লজ্জিত হয়ে উঠল। বলল, মাফ করবেন, আমার একবারে মনে ছিল না, মানে আমি—

নীরা বলে উঠল, স্ট্রেঞ্জ! এর মধ্যেই আপনি ভুলে গেলেন? আপনার খেয়াল নেই আর একজন আপনার সঙ্গে রয়েছে?

বিজিতের মুখ একেবারে অপরাধী বালকের মত হয়ে উঠল। কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে আবার বলল, মাফ করবেন, অন্যায় হয়ে গেছে।

নীরা মুখ ফিরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে ও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করল, মনে মনে একটু যেন লজ্জাও পেল।

নীরা বুঝতে পারছে, গতিটা বিজিতের কোন ইচ্ছাকৃত ব্যাপার না, এটাই তার স্বাভাবিক গতি। তার ভিতরটা পূর্ণমাত্রায় ছুটে বেড়াচ্ছে। তার গতিবেগটা এতই বেশি, নীরার একটু আগের কথা মনে নেই। কিন্তু মনে না থাকাটা অন্যায়। পাশেই নীরার অস্তিত্ব ভুলে যাবে কেন। ছেলেদের এই গতিবেগকে এই জন্যই ওর সন্দেহ হয়। ওরা যখন ছোটে তখন কোন দিকে খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকে না কার কোথায় কতখানি সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

নীরা বলল, আপনি তো রাস্তার দু'পাশটা দেখতে এসেছেন, না কি ?

বিজিত বলল, হ্যাঁ।

কিন্তু যেভাবে চালাচ্ছিলেন, তাতে দেখা হচ্ছিল ?

বিজিত বলল, আমি তো দেখতে দেখতেই যাচ্ছিলাম।

নীরা একটু হাসল, জিজ্ঞেস করল, কী দেখলেন ?

বিজিত বলল, এমনি বিশেষ কিছু না। মোটামুটি দুপাশের খোলা জায়গায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি ভাবছি মিঃ রায় ঠিক এ রাস্তার ওপরেই কারখানার কথা কেন ভেবেছিলেন। এ বিষয়ে আমাকে কিছু লেখেননি।

নীরা বলল, বোধহয় অন্য কোথাও সেরকম সুবিধার জায়গা নেই। কলকাতার আশেপাশে, কোথাও আর জায়গা আছে বলে তো মনে হয় না। বিজিত বলল, তা ঠিক। তবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কারখানা করবার সব দিক থেকে উপযুক্ত জায়গা এখানে পাওয়া যাবে কি না। প্রথমত কলকাতার সাহায্য আমাদের পেতেই হবে। দ্বিতীয়ত পোর্টের সাহায্য আমাদের দরকার। তারপর কাছাকাছির মধ্যে কাজের লোকজন জোগাড় না হলে অসুবিধা হবে। তা ছাড়া আমি বিশেষ করে ভাবছি, এ অঞ্চলে গভর্নমেণ্টের জমি আছে কি না।

নীরা জিজ্ঞেস করল, গভর্নমেণ্টের জমি কি আমাদের দরকার ?

বিজিত বলল, ফাইনান্স কর্পোরেশনের সাহায্যটা আমরা নিতে পারি। আপাতত গভর্নমেন্টের কাছ থেকে নিরানব্বুই বছরের লিজ নিয়ে কারখানা শুরু করা যায়। প্রাইভেট সোর্সের জমি পেতে নানান অসুবিধা আর জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা উৎসাহ পেতে পারি। এখনই জমির জন্য আমাদের টাকা খরচের দরকার হবে না। উপরন্তু, বিল্ডিং-এর জন্যও কর্পোরেশন আমাদের কিছু টাকা দিতে পারে। আমরা যা খরচ করব, তার ফিফটি পার্সেন্ট কর্পোরেশন দেবে। এনি হাউ, আমার মতে গভর্নমেন্টের জমি পেলেই ভাল হয়।

নীরা জিজ্ঞেস করল, সেটা কি ভাবে জানা যাবে ?

বিজিত বলল, রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। বিশেষ বিভাগে, যেখানে ম্যাপ আর নথিপত্র আছে।

বিজিত এতখানি ভেবেছে দেখে নীরা মনে মনে খুশি হল। জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয়, এদিকে কারখানা করলে অসুবিধা হবে ?

বিজিত বলল, সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। এ বিষয়ে আর সকলের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তবে মিঃ রায় যখন এ অঞ্চলের কথা ভেবেছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে কোন বিশেষ চিন্তা ছিল।

বিজিতের কথা শেষ হবার আগেই, নীরা দেখল, ডানদিকের নিবিড় নারকেল গাছের মাথার ওপরে খণ্ড খণ্ড বিচিত্র মেঘের সারি। বেলা শেষের রক্তাভা তার গায়ে। দূরে রূপনারায়ণের জল চিক চিক করছে। সামনেই রূপনারায়ণের সেতু। নীরা বলে উঠল, ওহ্, আমরা এখানে চলে এসেছি !

বিজিত বলল, আমরা পঞ্চাশ মাইল এসেছি ?

নিশ্চয়ই। এই তো রূপনারায়ণের ব্রিজ। এখানে দাঁড়াবেন না, ব্রিজটা পার হয়ে দাঁড়ান।

বিজিত ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকে গাড়ি দাঁড় করাল। আগে নীরা নামল। নেমে ও সোজা ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। সূর্য অস্ত গিয়েছে। আসন্ন সন্ধ্যা, কিন্তু এখনো ছায়াঘন দিনের আলো রয়েছে। রূপনারায়ণের এক দিকে রেলের সেতু। আর এক দিকে নদী একটা বাঁক নিয়ে দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে, স্রোতের ধারায়, রক্তিম আকাশের রক্তাভা লেগেছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। দূরে গাছপালা দুলছে।

নীরা ব্রিজের প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়াল। যেন মনে হল ও একটা স্বপ্নের জগতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর কানের পাশে বাতাসের শন শন শব্দ। কপালে গালে চুল উড়ে এসে পড়ছে। তবু সরিয়ে দেবার কোন ইচ্ছা হচ্ছে না। মনটা গভীর একটা প্রশান্তিতে যেন ভরে উঠছে। গভীর প্রশান্তির মধ্যে আস্তে আস্তে একটা বেদনার তরঙ্গ এসে দোলা দিতে লাগল। বাবার কথা মনে পড়তে লাগল। মীরার কথা মনে পড়ল। একটা তীব্র কষ্টের অনুভূতি, না, যেন একটা বিবাগী ব্যথার মত বুকের কাছে টন টন করতে লাগল। ভাবল, জীবনটা এমন নিবিড় গভীর প্রশান্তির শুধু না। এই নদীর মত বহু বাঁকে ফেরা, স্রোত এবং ঘূর্ণীর আবর্তে আবর্তিত। সুখ দুঃখ জ্বালা জটিলতা সবই তার মধ্যে থাকে।

নীরা কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ওর খেয়াল নেই। সহসা ফ্লুরেসেণ্ট আলোগুলো জ্বলে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ওর আচ্ছন্নতা কেটে গেল। দেখল নদীর বুকে সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে এসেছে। আকাশে কয়েকটা তারা ঝিকমিকি করছে। এবার ও ডাইনে বাঁয়ে তাকাল, দেখতে পেল ব্রিজের আর এক দিকে বিজিত পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা এগিয়ে গিয়ে ডাকল, চলুন।

বিজিত সঙ্গে সঙ্গে ফিরল, বলল, চলুন।

গাড়ির কাছে এসে বিজিত বলল, আপনার অনেক দেরি হয়ে

গেল। আপনাকে ডাকব ভাবছিলাম, কিন্তু মনে হল আপনি খুব তন্ময় হয়ে আছেন।

নীরা বলল, হ্যাঁ, আমার খুব ভাল লাগছিল। আমি এভাবে দাঁড়িয়ে রূপনারায়ণকে আর কখনো দেখিনি।

বিজিত গাড়ি স্টার্ট করল। ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সেতু পার হয়ে কলকাতার দিকে চলল। কিন্তু এবার গতিবেগ আর বাড়ছে না। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটবার পরে নীরা এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, শুনেছিলাম, আপনার মা আছেন। আরো কেউ আছেন নাকি?

বিজিত বলল, আর কেউ থাকবার কথা ছিল না। আমি বাইরে থাকবার সময়ে আমাব মামা মারা যান। ছেলেবেলা থেকে আমি মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছি। মামা মারা যাবার পবে, পরিবারের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। দুই মামাতো ভাইকে এখন আমার কাছে এনে রেখেছি। একজন ইস্কুলে আর একজন কলেজে পড়ে।

নীরা ভেবে দেখল, বিজিতের কর্তব্য এবং কৃতজ্ঞতাবোধ দুটোই আছে। কিন্তু কেন হঠাৎ ও এরকম একটা প্রশ্ন কবতে গেল! আসলে নীরার মনটা এখন বেশ উদার হয়ে উঠেছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বিজিত একজন ওর পদস্থ কর্মচারী, এটাকে কোন বাধা বলে মনে হচ্ছে না।

নীরা বিদেশের কথা তুলল। জানতে চাইল বিজিত সেখানে কেমন ছিল।

বিজিত বলল, কাজ আর লেখাপড়া নিয়েই ও ব্যস্ত ছিল। এতগুলো বছরের মধ্যে দু'সপ্তাহের জন্য ফ্রান্স আর এক সপ্তাহের জন্য ইটালিতে গিয়েছিল।

নীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আর কোথাও নয়?

বিজিত হেসে বলল, সময় ছিল না। ঠিক মত কাজ করতে গেলে সপ্তাহে একদিনের বেশি সময় পাওয়া যায় না। অন্যান্য দিনেও আড্ডা

দেবার সময় পাওয়া যায় না। মিঃ রায়ের খুব ইচ্ছা ছিল আমি যেন একবার ইউ. এস. ঘুরে আসি। সে সময় ছিল না। তবে উনি আমাকে জাপানে যে কারণে এক বছর কাটিয়ে আসতে বললেন, সে বিষয়ে কোন কথাই হল না। ভেবেছিলেন, আমি ফিরে এলে বলবেন।

নীরা চুপ করে রইল। ভাবল, বাবার অনেক ভরসা ছিল বিজিতকে নিয়ে।

বিজিত হঠাৎ বলল, আপনি একবার বাইরে ঘুরে আসুন না।

নীরা অবাক হয়ে বলল, আমি!

নয় কেন?

নীরা এ ভাবে বললেও, মনে মনে মনে বহুবার এই চিন্তাটা তার এসেছে। অনেকবার ভেবেছে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবে। আজকাল আর সে সব ভাবনা বিশেষ আসে না। যখন মীরা বেঁচে ছিল, যখন জীবনটা অন্য একটা স্রোতে চলছিল, তখন বাইরে যাবার কথা ভাবত। অনেকবার কথাবার্তাও হয়েছে, পৃথিবীর পশ্চিম জগৎটা ঘুরে আসবে। কিন্তু সে সব ভাবনা এখন অতলে চলে গিয়েছে।

নীরা বলল, ইচ্ছে করে।' কিন্তু এখন তো সামনে অনেক কাজ, বছর দুয়েক কোথাও যাওয়া যাবে না।

বিজিত বলল, কেন যাওয়া যাবে না। প্রাথমিক কাজকর্মগুলো শুরু করে দিয়ে অনায়াসেই চলে যেতে পারেন। আশা করি সে দায়িত্ব আমরা বহন করতে পারব।

নীরা হঠাৎ কোন জবাব দিল না। কেবল এই মুহূর্তে ওর মনে হল, ও কত একা। একলা একলা ও কোথায় যাবে। ইওরোপ আমেরিকায় একলা বেড়িয়ে বেড়াতে কি ওর ভাল লাগবে। অবশ্য এখানেও একলা। কিন্তু এই কলকাতায় একলা থাকার মধ্যেও জীবনের অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে। প্রতিদিনের অফিস আছে,

বাড়ি আছে, সর্বোপরি কলকাতা শহরটা আছে। এ কথা বিজিতকে বলা যায় না। সে বুঝবে না।

নীরা যদি বাবার সঙ্গেও যেতে পারত, তাহলে সব থেকে ভাল হত। সে কথা ভেবে আর লাভ নেই।

বিজিত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাদের ওপর ভরসা করতে পারছেন না ?

নীরা বলল, তা নয়। আপনাদের ওপর ছাড়া কাদের ওপর ভরসা করব। আসলে আমার যাবার সে রকম মন নেই।

বিজিত আবার বলল, আমার মনে হয় আপনি কিছুকাল বিদেশে কাটিয়ে এলে ভাল হয়। আপনাকে আমি যে রকম দেখেছিলাম, সেই তুলনায় আপনাকে অন্যরকম দেখছি।

নীরা মনে মনে অবাক হলেও সহজভাবেই জিজ্ঞেস করল, কী রকম ?

বিজিত বলল, মানে, আপনাকে যে রকম দেখেছি, সেরকম নেই। আপনি যেন খুবই টায়ার্ড আর ডিপ্রেসড্।

নীরার পক্ষে কি সেটা খুব আশ্চর্যের কথা ? আর বিদেশে গেলেই কি ওর বিমর্ষতা আর অবসন্নতা দূর হয়ে যাবে ? মনে তো হয় না। কিন্তু নীরার বিমর্ষ অবসন্নতা বিজিতের চোখেও পড়েছে ? বিজিত আসলে সেই পুরনো দিনের নীরার কথা বলছে। যখন নীরার জীবনটা ছিল রোমান্টিক রসে পূর্ণ। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসতে চাইল নীরা তা দমন করল।

গার্ডেনরীচ্ লেভেল-ক্রসিং খোলা আছে দেখে বিজিত বলে উঠল, যাক, খোলা আছে।

নীরা হেসে বলল, ভয় পাচ্ছিলেন বন্ধ থাকবে ?

কিছুই তো বলা যায় না।

নীরা হঠাৎ বলল, আপনি ইচ্ছে করলে স্মোক করতে পারেন।

বিজিত চমকে উঠে শব্দ করল, অ্যাঁ ?

নীরা মনে মনে হাসল। গাড়ি দাঁড় করাতে হলে বিজিত নেমে নিশ্চয় সিগারেট ধরাত। এতক্ষণ গাড়ি চালিয়ে আসছে, বেচারিকে একটু ধূমপানের অনুমতি দেওয়া দরকার।

বিজিত কিন্তু কোন কথা নয়, নীরার অনুমতি পেয়েই সিগারেট বের করে গাড়ি চালাতে চালাতেই বেশ পটুতার সঙ্গে দেশলাই জ্বেলে ধরাল।

নীরাদের বাড়ির সামনে এসে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন রাত্রি ন'টা বেজেছে। নীরা তখন সত্যি ক্লান্ত বোধ করছে। তবু বিজিতকে বলল, একটু চা বা কফি কিছু খেয়ে যান।

বিজিত বলল, এখন থাক। আপনার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যাই।

নীরা বলল, ঠিক আছে। পরশুর মিটিং-এ আপনি থাকছেন।

আচ্ছা। সম্মতি জানিয়ে বিজিত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নির্ধারিত দিনে মিটিং বসল। সকলেই এসেছেন। মধুসূদনের চিঠি এবং নোটবুক সকলেরই পড়া হয়ে গিয়েছে। কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ মুখার্জিও আজকের মিটিং-এ আছেন। বিজিতও রয়েছে। কিছুক্ষণ আলোচনার পরেই বোঝা গেল চীফ এঞ্জিনিয়র মিঃ ঘটক এবং বাইরের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনজন নতুন প্রজেক্টের বিরুদ্ধে মত পোষণ করছেন। তাঁরাই তাঁদের বক্তব্য আগে বললেন। পদাধিকার বলে মিটিং-এর সভাপতি নীরা।

অন্যান্যেরা কিছু বলার আগে ব্রজকিশোর সভার কাছে প্রস্তাব করলেন, কোম্পানীর অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ এঞ্জিনিয়রকে কিছু বলতে

দেওয়া হোক। নীরার সঙ্গে তাঁর সেভাবেই কথা হয়েছিল। নীরা সম্মতি দিল।

বিজিত উঠে দাঁড়াতেই, বিরুদ্ধ সদস্যদের একজন বললেন, বোর্ডের সদস্য হিসাবে স্বয়ং চীফ এঞ্জিনিয়র যখন অন্য মত পোষণ করেন, তখন সদস্য না হয়েও অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফের কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

নীরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি মনে করি আছে। কারণ স্বর্গত মধুসূদন রায় বেঁচে থাকতে এঁর সঙ্গে নতুন প্রজেক্ট নিয়ে অনেক পত্রালাপ করেছেন, আপনারা জানেন। এবং নতুন প্রজেক্টের কথা ওঁর চিঠি থেকেই উত্থাপিত হয়েছে। সেই হিসাবে, আমি মনে করি, সভার কাছে উনি বললে ভাল হয়।

মিঃ ঘটক বলে উঠলেন, এ বক্তব্য কি রেকর্ড হবে ?

নীরা বলল, যদি আপনারা না চান, হবে না। তবে আমি কোন বাধা দেখি না।

ঘটক বললেন, কিন্তু উনি বোর্ডের সদস্য নন।

ব্রজকিশোর বললেন, ঠিক আছে, রেকর্ড হবে না।

মিঃ ঘটকের এবং আরো কয়েকজনের মুখের বিরক্তি ও গাম্ভীর্য তাতে ঘুচল না। বিজিত বলতে উঠল। একটানা প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে সে বলে গেল। ভবিষ্যতের প্রজেক্টের সে একটা মোট চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরল। বিশেষ ভাবে বলতে চাইল, নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকবে। নতুন কোন চাপ সৃষ্টি হবে না। সদস্যদের মনে এটা নিয়ে কোন ভীতি থাকতে পারে ভেবেই সে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে বলল। মার্কেট সম্পর্কে সে যে নির্ভয় সে কথাও জানাল। সবশেষে তার বক্তব্য : এসব তার নিজের কথা নয়, মিঃ রায়ের কথাই সে একটু ছকে সাজিয়ে বলল মাত্র।

বিজিত বলবার সময় কোন বাধা পেল না। সকলেই মনোযোগ

দিয়ে শুনল। তারপরে ব্রজকিশোর বললেন, মোটামুটি বিজিতের বক্তব্যের সমর্থনে। বাকী তুজন সদস্য, কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী আর চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট মিঃ মুখার্জী নতুন প্রজেক্টের সমর্থনে মতামত দিলেন। মিঃ মুখার্জী অর্থকরী দিকটাই বিশদ ভাবে বললেন। সকলের শেষে নীরা বলল। ওর কথায় অবিশ্যি যুক্তির থেকে আবেগটাই বেশি প্রকাশ পেল। ও এই নতুন প্রজেক্টকে পিতার আরব্ধ কাজ এবং ব্রত পালন হিসাবে ব্যাখ্যা করল।

এই মিটিং-এই মোটামুটি স্থির হয়ে গেল, নতুন প্রজেক্ট হবে। পববর্তী আব একটি সভা ডাকা হল। বিষয়সূচী, কী ভাবে প্রাথমিক কাজ শুরু হবে।

পরবর্তী সভার আগেই, বিজিত একদিন টেলিফোন করে নীরার কাছে এল। রাইটার্স থেকে হাওড়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাণ্ডের একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছে। পঁচিশ মাইলের মধ্যেই একটা জায়গাও সে চিহ্নিত করে এনেছে। জায়গাটা রাস্তার ওপরেই। নীরা ব্রজকিশোরকে ডাকল। তিনজনে মিলে জায়গাটার বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। বিজিতের বক্তব্য: যতটা কাছাকাছি থাকা যায় ততই ভাল। সে এখনই জায়গাটা দেখে আসতে চায়। কেননা তারপরেই অনেকগুলো কাজ আরম্ভ করতে হবে। নীরা নিজে তো সঙ্গে যেতে চাইলই, ব্রজকিশোব-কেও নিয়ে যেতে চাইল। আজ আর নীরা বিজিতকে গাড়ি চালাবার সুযোগ দিল না। ওর নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোল। চালক ওর ড্রাইভার।

যাবার সময় রাইটার্স থেকে বিজিত তার পরিচিত একজন কর্মচারাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। এই কর্মচারীটি জায়গাটা সঠিক দেখাতে পারবে।

গন্তব্যে পৌঁছে জায়গাটা বের করতে বেশি সময় লাগল না। প্রায় কুড়ি বিঘার মত জমি। রাস্তা থেকে খুব বেশি নিচে না হলেও

জমিটা নিচুই। রাস্তার সমান করতে বেশ কিছু ব্যয় হবে। ব্রজকিশোর নিচু জমি দেখে একটু আপত্তি তুললেন। সরকারী কর্মচারীটি এ অঞ্চলের জমি সম্পর্কে বিশেষ অবহিত। সে জানাল, গভর্নমেণ্টের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাণ্ড সবই প্রায় একরকম। বরং কোথাও কোথাও জমি এর থেকেও নিচু। কলকাতার কাছাকাছি এর থেকে ভাল জমি পাওয়া অসম্ভব।

নীরা দেখল বিজিত আর কোন জমি দেখবার পক্ষপাতী না, এবং সে যেন ধবে নিচ্ছে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এমন কি বিজিত একথাও একবার বলল, বেশি দেখতে গিয়ে কালহরণ হবে মাত্র। যেন সব ব্যাপাবটা বিজিতের একলারই। এটাকে নীরার ঈর্ষা বলা যাবে কি না বলা যায় না, কিন্তু ও রেগে উঠল। ও ব্রজকিশোরকে বলল, বোস কাকা, জমি সম্পর্কে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমরা আরো জমি দেখতে চাই।

বিজিত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করল না। ব্রজকিশোর বললেন, মিঃ মুখার্জী, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী এবং অন্য একজন এক্সপার্টকে দিয়ে দেখিয়ে মতামত নিলেই হবে।

নীরা বলল, তাই করুন।

এ বিষয়ে বিজিতের সঙ্গে নীরা আর কোন কথা বলল না। ব্রজকিশোর একবাব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মত কী বিজিত?

বিজিত বলল, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে।

বিজিতের জবাবটা শোনবার জন্য নীরা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। জবাব দেবার সময় একবার নীরার দিকেও দেখল। নীরা ওর গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে নিল।

পরের দিনই ব্রজকিশোরের সঙ্গে আবার জমি নিয়ে কথা হল। একজন সরকারী সিভিল এঞ্জিনিয়রকে ডাকা হল। তারপরে মিঃ মুখার্জী এবং চক্রবর্তীকে নিয়ে নীরা আবার জমিটা দেখতে গেল।

এবার আর বিজিতকে ডাকা হল না। কিন্তু সকলের মতে এ জায়গাটাই উপযুক্ত বিবেচিত হল। নীরা তথাপি আরো জমি দেখবার কথা তুলল। কেউ আপত্তি করল না। সারাদিনের সময় নিয়ে আরও জমি দেখা হল। এক্সপার্টের মতামত নিয়ে দেখা গেল, প্রথম জায়গাটাই ঠিক বাছাই করা হয়েছে।

এই সাত দিনের মধ্যে আর একটা মিটিংও হয়ে গিয়েছে। সেই মিটিং-এ বিজিতকে ডাকা হয়নি। ব্রজকিশোর বলেছিলেন, নীরা প্রয়োজন বোধ করেনি। সেই মিটিং-এ গভর্নমেন্টের সঙ্গে জমি নিয়ে নেগোসিয়েশনের বিষয় স্থির হয়েছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অফিসার মিঃ নন্দীকে।

প্রায় ন'দিন পরে নীরা বিজিতকে টেলিফোন করল। তাকে কারখানায় পাওয়া গেল না। নীরা জানিয়ে রাখল, সে এলেই যেন ওকে অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিজিত এল চারটের পরে। নীরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, আপনার খবর কী, কোথায় ছিলেন আপনি?

বিজিত বলল, আজকের সকালের কথা বলছেন?

না, গত ন'দিন ধরেই আপনার কোন খবর নেই।

বিজিত বিব্রত হয়ে বলল, আপনি খোঁজ করেছিলেন নাকি আমার?

নীরা বলল, খোঁজ না করলে আসতে নেই?

বিজিতকে একটু বিষাদগ্রস্ত মনে হল। কী বলবে ভেবে পেল না। একটু পরে বলল, আপনি ডাকেননি। তাই আসিনি।

নীরা জিজ্ঞেস করল, ওবেলা কোথায় ছিলেন?

রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিলাম।

কেন?

আই. আর. ও. মিঃ নন্দী ডেকে নিয়ে গেছলেন।

আপনাকে ! কেন ?

জমির ব্যাপারে নেগোসিয়েশনের জন্য কথাবার্তা বলতে।

তার মানে কী মিঃ নন্দী তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারলেন না ?

বিজিত বলল, তা ঠিক নয়। মিঃ নন্দী জানতেন, আমি আগেই নেগোসিয়েশন কিছুটা এগিয়ে রেখেছিলাম।

আগেই এগিয়ে রেখেছিলেন ? তার মানে আপনি জানতেন ওই জমিটাই নেওয়া স্থির হবে ?

অনুমান করছিলাম।

নীরার মনের উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছিল। ওর ইচ্ছা ছিল বিজিতকে ডেকে ও নিজেই বলবে, প্রথম দেখা জমিটাই কারখানার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে এবং বিজিতের সিদ্ধান্তই ঠিক। কিন্তু বিজিত সেজন্য অপেক্ষা করেনি, সে নিজে যা বুঝেছে তাই করছে। নীরা বলল, কিন্তু নেগোসিয়েশনের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি ! আপনি আগেই কথা বললেন কেন ?

বিজিত বলল, ভাবলাম কাজটা এগিয়ে থাকবে।

নীরা বলল, অন্যায় করেছেন। আর এভাবে কাজ এগিয়ে রাখবেন না।

বিজিত একবার নীরার দিকে দেখল, বলল, আচ্ছা।

বিজিত প্রায় এক কথাতেই যেন সব শেষ করে দিল। নীরা জিজ্ঞেস করল, আরো কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছেন নাকি ?

রেখেছি।

নীরার চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কী করেছেন ?

বিজিত বলল, জমিটা ইমিডিয়েট্‌লি উঁচু করবার জন্য ছাই রাবিস আর মাটি ঢালবার ঠিকেদারকে ডেকেছি।

সে কার সঙ্গে কথা বলবে ?

আপনাদের সঙ্গে।

ওকে আপনি ডাকতে গেলেন কেন?

বিজিত চুপ করে রইল, কোন জবাব দিল না। এতক্ষণ অনেক প্রশ্নের জবাব দেবার পরে, এই প্রথম দেখা গেল, সে নীরব এবং তার মুখ শক্ত অথচ একটা হাসির ছোঁয়া যেন লেগে আছে। শুধু তা-ই না, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি এসবে আপত্তি করছেন?

নীরা বলল, হ্যাঁ, আপনার যা কাজ আপনি তাই করবেন।

বিজিত বলল, আচ্ছা।

নীরা পরমুহূর্তে আর কোন কথা খুঁজে পেল না। বিজিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তা হলে এখন যাচ্ছি।

নীরা কিছু জবাব দেবার আগেই ব্রজকিশোর ঢুকলেন। নীরাকে কিছু বলতে গিয়েও বিজিতকে দেখে বলে উঠলেন, এই যে বিজিত, তুমি এখানে আছ, ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ দরকার।

বিজিত চকিতে একবার নীরার মুখের দিকে দেখল, জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার বলুন তো?

ব্রজকিশোর বললেন, মিনিস্টার মজুমদারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে না?

হ্যাঁ।

তোমার সঙ্গে কথা বলে উনি খুব খুশি। এইমাত্র আমার সঙ্গে ফোনে কথা হল। জমির ব্যাপারে তদন্তের জন্য উনি দেরি করবেন না। বললেন, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের হাতে বিষয়টা তুলে দিলে দেরি হবে, উনি এক সপ্তাহের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমাকে উনি আগামী পরশু আর একবার যেতে বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে জমি উঁচু করার জন্য তুমি যে ঠিকেদারকে বলেছ, আমাদের আই. আর. ও. তার

বদলে আর একজনের কথা বলছে। কিন্তু মিঃ নন্দী যার কথা বলছে আমি জানি সে লোকটা ফাঁকিবাজ। আমাদের হেভি প্রজেক্টের ব্যাপারে—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বিজিত নরম গম্ভীর স্বরে বলল : মিঃ বোস, ও লোকটিকে ডেকে আমি অন্যায় করেছি। এ বিষয়ে আপনারা যা ব্যবস্থা করবেন, তাই হবে।

ব্রজকিশোর অবাক হয়ে বললেন, তার মানে?

বিজিত কিছু বলল না। ব্রজকিশোর একবার নীরার দিকে দেখলেন।

নীরা বলল, বসুন বোসকাকা।

বিজিত আবার বলল, আমি যাচ্ছি।

সে বেরিয়ে গেল। ব্রজকিশোর অবাক হয়ে নীরার দিকে তাকালেন। নীরার চোখে মুখে লজ্জা ফুটে উঠল। ব্রজকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বল তো? বিজিতকে একটু অন্যরকম লাগল।

নীরা বলল : আমি বিজিতবাবুকে কয়েকটা কথা বলেছি। অবিশ্যি কথাগুলো একটু রাফ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে উনি সমস্ত ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি করেছেন।

ব্রজকিশোর তবু অবাক, বললেন : তাই নাকি? কি ব্যাপারে বল তো?

নীরা সব ঠিক বলতে পারছে না, এমনি একটা ভাব। তারপরে জানাল, বিজিতকে ও কি কি বলেছে। ব্রজকিশোর সব শুনে চুপ করে রইলেন।

নীরা জিজ্ঞেস করল, আমি কী অন্যায় করেছি বোসকাকা?

ব্রজকিশোর আমতা আমতা করে বললেন, দোষ ঠিক বলব না, তবে কী না, ওকে বোধহয় এতটা না বললেই পারতে। সকলেই সকলের কাজ করবে ঠিকই, তবু আমার মনে হয়, বিজিতের দায়িত্বই

বোধহয় বেশি। ও যা করছে, তা ওর উৎসাহে আর গরজেই করছে। তবে তোমার যদি মনে হয়ে থাকে—

নীরা বলে উঠল, না, না, আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। এখন বরং মনে হচ্ছে আমি ওঁকে একটু বেশি বলে ফেলেছি।

নীরা নিজের মনটা বুঝতে পারছে। কিন্তু সে কথা ব্রজকিশোরকে বোঝাতে পারছে না। নীরা মনে মনে বিজিতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে, সে কথা কেউ জানে না। ও বলল, জমি উঁচু করার জন্য বিজিতবাবু যাকে কণ্ট্রাক্ট দিতে চান, তাকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ব্রজকিশোর বললেন, তাই করব। তোমাকে একটা কথা বলি। বিজিত কেবল একটা প্রবল উৎসাহ নিয়েই নামেনি, একটা চ্যালেঞ্জও ওর মধ্যে আছে। আমার মনে হয়, তুমি ওর প্রতি নির্ভর করতে পার।

নীরা বলল, তাতে বিজিতবাবুব ওপরে বেশি চাপ পড়বে না কী?

ব্রজকিশোর বললেন, চাপ পড়লে ও নিজেই বলবে। তবে সমস্ত ব্যাপারটার প্রস্তুতি-পর্ব সবই ওর মাথার মধ্যে তৈরী হয়ে আছে।

নীরা স্বীকার করল, আমার ভুলই হয়ে গেছে। আমি সব ঠিক করছি।

ব্রজকিশোর আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। নীরা হাত তুলে ঘড়ি দেখল। খানিকটা অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা ফাইলপত্র দেখল, দু-একটা রিপোর্ট এবং চিঠি পড়ল। এইভাবে আধঘণ্টা সময় কাটিয়ে কারখানায় টেলিফোন করল। বিজিতকে চাইল। শোনা গেল, সে কারখানায় নেই। আর প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আবার ফোন করল। তখন শোনা গেল, বিজিত কারখানায় নেই।

নীরা অতঃপর মিঃ নন্দীকে ডাকল। তারসঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। মিনিস্টার কী বলেছেন না বলেছেন, জমির ব্যাপারে কত দেরি হতে পারে ইত্যাদি। যদিও সবই ওর জানা। ভেবেছিল নন্দীকে

জিজ্ঞেস করবে, তিনি কেন বিজিতকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। নন্দী নিজে থেকেই সে কথা বললেন, বিজিত যাওয়াতে কী সুবিধা হয়েছে, মিনিস্টার কী রকম ইম্প্রেসড্ হয়েছেন তাও বললেন। নন্দীকে বিদায় দিয়ে নীরা মিঃ মুখার্জিকে ডাকল, তারসঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। প্রধানত নতুন প্রজেক্ট এবং ব্যাংকে তার নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা নিয়ে কথা হল। মিঃ মুখার্জিকে বিদায় দিয়ে আবার কারখানায় টেলিফোন করল। অফিস বেয়ারার সেই একই জবাব, সাহেব এখনো কারখানায় আসেননি।

নীরা ঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা। তার মানে, আজ বিজিত কারখানায় ফিরবে না। নীরার এখান থেকে বেরিয়ে, হয় সে বাড়ি গিয়েছে বা অন্য কোথাও গিয়েছে। কোথায় যেতে পারে কে জানে। একটা অস্বস্তি আর অশান্তির কাঁটা মনের মধ্যে বিঁধে আছে। বিজিতের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। এখন নিজের উত্তপ্ত কথাগুলো মনে করে নিজেরই লজ্জা করছে। ওর চোখের সামনে ভাসছে বিজিতের জিজ্ঞাসু অবাক চোখ। সে বুঝতে পারছিল না, নীরা কেন ওরকম করে কথা বলছে।

ব্রজকিশোর এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি যাবে তো নিরু?

নীরা বলল, হ্যাঁ, এইবার যাব।

নীরা ভেবেছিল, ও কারখানায় যে কয়েকবার টেলিফোন করেছে, সে খবর পেয়ে বিজিত নিশ্চয় ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিন্তু পরের দিন বিজিতের কাছ থেকে কোন টেলিফোন পর্যন্ত এল না। নীরাও টেলিফোন করল না। ভাবল, দেখা যাক বিজিত কী করে।

বিজিত কিছুই করল না। তার পরের দিন বেলা তিনটের একটু আগে ব্রজকিশোর এলেন নীরার ঘরে। গম্ভীরভাবে বললেন, মিঃ নন্দীর আজ বিজিতকে নিয়ে রাইটার্সে যাবার কথা। মিনিস্টার মজুমদার চারটের সময় যেতে বলেছেন। বিজিতকে বিশেষ করে। মিঃ

নন্দী এখন বিজিতকে কারখানায় টেলিফোন করেছিলেন আসবার জন্য। বিজিত জানিয়েছে, ডিরেক্টরের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব না।

নীরার ভুরু কুঁচকে উঠল, বলল, তাই নাকি?

ব্রজকিশোর বললেন, ছেলেমানুষ আর কাকে বলে। মিনিস্টার ওকে খাতির করে যেতে বলেছেন, সেসব ওর গ্রাহ্য নেই।

নীরার চোখে বিজিতের মুখটা ভাসল। ছেলেমানুষ তো বটেই, এখন বোঝা যাচ্ছে, গোঁয়ারও আছে খানিকটা। ছেলেমানুষি গোঁয়ার্তুমি। ও জিজ্ঞেস করল, মিঃ নন্দীর সঙ্গে আমি গেলে কেমন হয়?

তুমি যাবে? সেটা অবিশ্যি খারাপ কিছু হবে না, তবে—। ব্রজকিশোর কথাটা শেষ করলেন না।

নীরা জিজ্ঞেস করল, ইনফ্লুয়েন্সড্ হবেন না?

মজুমদার অলরেডি ইনফ্লুয়েন্সড্, বিজিত সব করেই এসেছে। বিজিতকে ওঁর খুব ভাল লেগেছে।

নীরা একবার ভাবল, বিজিতকে ভাল লাগতে পারে, ওকেই বা লাগবে না কেন। কিন্তু ও নিজেকে সংযত করল। নিজের জিদের জন্য কাজের ক্ষতি করে লাভ নেই। ও টেলিফোন করল বিজিতকে।

বিজিতের চেনা গলা শোনা গেল, হ্যালো, বিজিত দত্ত।

আমি মিস রয় বলছি।

বলুন।

আপনি মিঃ নন্দীর সঙ্গে এখনই রাইটার্সে চলে যান, ব্যাপারটা জরুরী।

নিশ্চয়ই যাব, এখনই যাচ্ছি।

বিজিতের গলার স্বর এত মোলায়েম আর বাধ্য, যে নীরার কানে বিদ্রূপের মত শোনাল। ও বলল, রাইটার্স থেকে ফিরে এখানে একবার আসবেন।

আচ্ছা।

নীরা ফোন নামিয়ে রাখল।

ব্রজকিশোর বললেন, আমি নন্দীকে খবরটা দিই।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। নীরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপরে কাজে মন দেবার চেষ্টা করল।

সাড়ে পাঁচটার সময় ব্রজকিশোর এসে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি যাবে তো?

নীরা বলল, বিজিতবাবুকে আসতে বলেছি। আপনি চলে যান, আমি পরে যাচ্ছি।

ব্রজকিশোর বললেন, বিজিতের সঙ্গে কাল কথা বললেও তো হবে। কতক্ষণ বসে থাকবে?

নীরা বলল, বলেছি যখন একটু দেখে যাই।

ব্রজকিশোর বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন, কোন কিছু নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নীরা বুঝতে পারছে ব্রজকিশোর চিন্তিত হচ্ছেন। নীরা কি সত্যি খুব দুশ্চিন্তা করছে? ওর নিজের সেরকম তো মনে হচ্ছে না। সামনে এত বড় একটা কাজ, তারজন্যে ওর মনে একটুও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। কেন নেই তা ও জানে না। ওর নিজেরও ধারণা সব ঠিক হয়ে যাবে। ওর নিজের যদি কোন চিন্তা থাকে, তা হলে একটাই আছে, নতুন কাজের মধ্যে ওর ভূমিকা যেন ছোট হয়ে না যায়।

প্রায় পৌনে সাতটার সময় বিজিত এল। নীরা ঘড়ি দেখে বলল, বসুন।

বিজিত বসল। নীরা জিজ্ঞেস করল, মিঃ নন্দী কোথায়?

তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

রাইটার্সে আজ কী হল বলুন?

সবই হয়ে গেল। আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছলাম। ম্যাপ কাগজ পত্র সবই সঙ্গে ছিল। মিঃ মজুমদার দুজন অফিসারকে ডেকে পাঠালেন, কথা বললেন, কাগজপত্র দেখলেন, বলতে গেলে ঘরে বসেই তদন্ত করলেন, অনুমোদন পত্রে সই করেও দিয়েছেন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিভাবে আমরা অগ্রসর হব, কী চিন্তা করছি। সব শোনবার পরে, অফিসারদের বিদায় দিয়ে বললেন, তাঁর কিছু বেকার ক্যাণ্ডিডেট আছে, ভবিষ্যতে তাদের যেন আমরা কাজে নিই। অবিশ্যি যার যে-রকম যোগ্যতা, তাকে সেইভাবে নিলেই হবে। আমি বলেছি, আমরা তা নেব। বলেই বিজিত নীরার দিকে একবার দেখল, আপনার কি মনে হয় ঠিক বলেছি?

বিজিত কথাটা কেন বলল, নীরা তা জানে। বলল, ঠিকই তো বলেছেন। একটু থেমে নীরা আবার বলল, যখন যেটা ভাল বুঝবেন সেই রকমই বলবেন বা করবেন, তারজন্যে জিজ্ঞাসাবাদের দরকার নেই।

নীরা কথাটা বলছিল টেবিলের দিকে তাকিয়ে, পেনসিল ঠুকতে ঠুকতে। কথার শেষে চোখ তুলে দেখল, বিজিত ওর দিকে জিজ্ঞাসু অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বিজিত দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাল। বলল, আপনি শুধু আমাকে একটু বিশ্বাস করবেন।

নীরা বলল, আপনাকে আমি একটুও অবিশ্বাস করি না। কেবল একটা কথা, আমাকে সব কিছু জানাবেন।

বিজিত বলল, কোন কাজই আপনাকে না জানিয়ে করা সম্ভব না। কেবল ছোটখাটো কাজে আপনাকে ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। দেখছি তো, আপনার ওপর কত কাজের চাপ।

নীরা বলল, তা হোক, আমি কাজকে ভালবাসি, তা সে ছোট বড় যা-ই হোক। কাজই আমার জীবন।

বিজিত নীরার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিজিতের দিকে তাকিয়ে

নীরার হঠাৎ কেমন লজ্জা করে উঠল, বিজিতের চোখে যেন একটা বিষণ্ন করুণ ছায়া। কেন, বিজিতের এই দৃষ্টির অর্থ কী? মুহূর্তের মধ্যেই নীরা অনুমান করে নিল। নীরার জীবনটা শুধু কাজের, এই কথাটাই বিজিতের দৃষ্টি বদলে দিয়েছে। নীরা গম্ভীর হয়ে উঠল। ও উঠে দাঁড়াল। বিজিতও উঠে দাঁড়াল। নীরা টেবিলের পাশ থেকে ওর ব্যাগ তুলে নিল। জিজ্ঞেস করল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

বিজিত ঘড়ি দেখে বলল, আপাততঃ বাড়ি।

নীরার পিছন পিছন বিজিত ঘরের বাইরে এল। অফিস ফাঁকা। নীরার বেয়ারা দুজন দাঁড়িয়ে আছে। সেলাম করল। দুজনেই লিফ্‌টে নিচে নেমে এল। বিজিত বলল, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল আজ।

নীরা বলল, আপনার?

আমার তো রোজই দেরি হয়। আমি এ সময়ে কারখানা থেকে ফিরি।

নিচে গাড়ির সামনে এসে নীরার ড্রাইভার এগিয়ে আসবার আগেই বিজিত গাড়ির দরজা খুলে ধরল। নীরা চকিতে একবার বিজিতের দিকে দেখে গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বিজিত দরজা বন্ধ করে দিল। নীরা অস্ফুটে একবার বলল, চলি।

ওর গাড়ি এগিয়ে গেল।

এর পরে নতুন প্রজেক্টের কাজ শুরু হল পূর্ণোদ্যমে। এক বছরের মধ্যে নতুন কারখানা ইমারত গড়ে উঠল। বিদেশ থেকে ভারি যন্ত্রপাতিও এসে পড়েছে; এবং তা বসতেও আরম্ভ করেছে। মেসিনারি সবই কানাডা থেকে আনা। যে-কোম্প্যানি মেসিনারি দিয়েছে তারা একজন বিশেষজ্ঞও পাঠিয়েছে।

বিজিত প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। নীরাও বাদ নেই। নীরা দুদিক সামলে চলেছে। একদিকে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ, আর একদিকে নতুন কারখানা। অবিশ্যি বিজিতও দুদিক রক্ষা করে চলছে। বিজিত নীরার কথা রেখেছে। সে সব সময়ে নীরাকে সব জানিয়েছে, বুঝিয়েছে। নীরা নিজের উৎসাহে সব সময়েই নতুন প্রজেক্টের কাজে থাকবার চেষ্টা করে। প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় অফিস থেকে বেরিয়ে পঁচিশ মাইল দূরে নতুন কারখানায় যায়। হয় একলা না হয় বিজিতের সঙ্গে। ফিরতে রোজই অনেক রাত্রি হয়ে যায়। বিজিত বা ব্রজকিশোর দুজনেই নীরাকে নিরস্ত করতে চায়, পারে না। কিন্তু এ সবের মধ্যে নীরার কাছে আজ আর গোপন নেই, বিজিত সব সময়েই ওর কাছে কাছে থাকতে চায়। বিজিত মুখে বলে, নীরার এত পরিশ্রম সইবে না। তবু অফিসে বা কারখানায় সে নীরাকে খুঁজে বেড়ায়, টেলিফোনে যোগাযোগ করে। নীরার আর সেই মন সেই চোখ না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু ওকে দেখলে যে বিজিতের চোখে মুখে আলো ফুটে ওঠে, ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, তা ও স্পষ্ট দেখতে পায়।

নীরা ভাবে, ওর নিজেরও কি সে-রকম কিছু হয়? যত ভাবে, বিজিতের সামনে তত গম্ভীর হয়ে উঠতে চায়। না, বিজিতের চোখের আলোকে ও আর উজ্জ্বল করে তুলতে চায় না। জীবনের একটা দিকে ওর যবনিকা পড়ে গিয়েছে। সেখানে আর কোন নতুন দৃশ্যের অবতারণা ঘটবে না।

ইতিমধ্যে কয়েকবার নতুন কারখানার কাজ দেখাশোনা করে নীরা বিজিতের সঙ্গে রূপনারায়ণের ব্রিজে গিয়েছে। কিন্তু গিয়েই আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। মনে মনে ওর একটাই ধ্বনি, না-না-না।

হু'বছর পূর্ণ হবার আগেই কারখানা সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। এবার কারখানা উৎপাদনের জন্য তৈরি। কানাডার বিশেষজ্ঞ আগেই ফিরে গিয়েছে। কারখানায় নতুন লোক ভরতি চলছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের প্রতিদিন নিয়োগ করা হচ্ছে। স্থানীয় লোকদের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু অতিরিক্ত লোক বাইরের নানান জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে। এমন কি নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং থেকেও আপাততঃ কিছু মেকানিককে নতুন কারখানায় নেওয়া হয়েছে। বিজিত-ই প্রথম নতুন কারখানার নাম পেশ করেছে, সকলেই তা সানন্দে অনুমোদন করেছে। বিশেষ করে নীরা। নতুন কারখানার নাম দেওয়া হয়েছে, 'মধুসূদন হেভি ইলেকট্রিকাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড।' তা ছাড়াও বিজিত একটি প্রস্তাব দিয়েছে, অফিস বিল্ডিং-এর সামনে যে বাগান তৈরি হচ্ছে, সেখানে মধুসূদনের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হোক। নীরা খুশি হয়েছে, অবাক হয়েছে আর ভেবেছে, এ সব চিন্তা কি কেবল বিজিতের মাথায় আসে? নীরার মাথায় আসে না কেন? সব বিষয়েই নিজেকে বিজিতের কাছে পরাজিত মনে হয়। হু বছর আগে হলে, বিজিতের ওপর নীরার রাগ হত। এখন আর হয় না। ও এখন বিজিতকে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, কেবল গম্ভীর কৃতজ্ঞতা বোধ, না মধুসূদনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা-ই তাকে সতত চেতনায় জাগ্রত করে রেখেছে। তার ভিতর দিয়েই বিজিতের চরিত্রের বৈশিষ্ঠ্য এবং নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে।

কর্মী নিয়োগের সময়েই, কলকাতার একজন সুবিখ্যাত ভারস্করকে দিয়ে, মধুসূদনের আবক্ষ মর্মর মূর্তি তৈরি করান হল। ব্রজকিশোর মত প্রকাশ করলেন, কারখানার দ্বারোদ্ঘাটনের দিনই, মধুসূদনের মূর্তি উন্মোচন করা হোক এবং তা করা হোক শ্রমমন্ত্রীর দ্বারাই, যিনি

কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করবেন বলে তিনি আশা করছেন। এসব বিষয়ে আলোচনা চলছিল, নীরার কলকাতার অফিস ঘরে বসেই।

ব্রজকিশোরের কথা শুনে নীরা বিজিতের দিকে তাকাল। বিজিত তখন মাথা নিচু করে। একটি বিদেশী এঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকার পাতা উল্টে দেখছিল। বিজিতের এরকম আচরণ মোটেই খুব স্বাভাবিক মনে হল না। বিশেষ করে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের সময়। নীরা বিজিতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, ব্রজকিশোরের দিকে তাকাল। ব্রজকিশোরও ওর দিকে তাকালেন। দুজনের চোখেই কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা।

নীরা জিজ্ঞেস করল, 'বিজিতবাবু, আপনি কী কিছু ভাবছেন?'

বিজিত যেন খানিকটা চমকাবার ভাব করে, মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'না, কিছুই ভাবছি না।'

নীরার চোখে সংশয়। জিজ্ঞেস করল, 'বোসকাকা যা বললেন, আপনি সব শুনেছেন তো?'

বিজিত খুব সংক্ষেপে বলল, 'শুনেছি।'

বিজিতের এই সংক্ষিপ্ত জবাবে, নীরার সন্দেহ দৃঢ় হল, বিজিত ঠিক মন খুলে কথা বলছে না। আজকাল বিজিতকে চিনতে ওর বেশি সময় লাগে না। আগে হলে হয়তো বিজিতের এই আচরণকে ওর কিছুই মনে হত না। এতক্ষণে ব্রজকিশোরের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছে। সব বিষয়ে উৎসাহী বিজিতের কথাবার্তা এরকম হওয়া উচিত না। নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে কোথাও কিছু আটকাচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই নীরা ভ্রূকুটি দেখা দিল। ও যেন একটু বিরক্তই হল। জিজ্ঞেস করল, 'বোসকাকা যা বললেন, সে বিষয়ে আপনার কী মনে হচ্ছে?'

বিজিত স্বাভাবিক মুখেই বলবার চেষ্টা করল, 'ঠিকই তো আছে। কোন অসুবিধা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

নীরা বিজিতের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বিজিত তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। নীরার মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না, ব্রজকিশোরের প্রস্তাব সমূহ বিজিত গ্রহণ করতে পারেনি। নীরার খারাপ লাগছে, বিজিত সে কথা মুখ ফুটে বলছে না কেন! যে অন্যান্য বিষয়ে এত কথা নিজের থেকেই বলতে পারে, তার হঠাৎ এরকম দ্বিধা বা বিরাগ কেন! যদিও ব্রজকিশোবের প্রস্তাব, নীরার খুবই উপযুক্ত বলে মনে লেগেছে।

এবার নীরা কিছু বলবার আগেই, ব্রজকিশোর বিজিতকে বললেন, 'বিজিত' তোমার কথাব মূল্য অনেকখানি। আমার প্রস্তাবে যদি তোমার কিছু মনে হয়ে থাকে, তুমি অনায়াসে বলতে পার। আজকাল তো তোমার সঙ্গে কথা না বলে কোন ডিসিশনই আমরা নিই না।'

বিজিত খানিকটা বিব্রতভাবে বলল, তারজন্য না। এসব বিষয়ে, এই উন্মোচন উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি নিয়ে আপনারা যা ঠিক করবেন, তাই হবে। এতে আমার আর কী বলার থাকতে পারে।'

নীরা সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'আপনার বলার কিছু না থাকতে পারে। জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আপনার নিজেব ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনি কী করতেন?

বিজিত একবার নীরার অপলক ঝলকানো চোখের দিকে দেখল।

ব্রজকিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'আসলে কী জানেন, কোন বিষয়েই মন্ত্রী আমলা বা রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে কিছু করা আমাব মনঃপুত নয়।'

নীরা বলে উঠল, 'সে কথাটা বলছেন না কেন?'

বিজিত গম্ভীরভাবেই বলল, 'কিন্তু আপনাদের এসব বিষয়ে কিছু বলতে আমার সংস্কোচ হচ্ছিল। এটা নিতান্তই আমার একটা নিজস্ব মতামত। আপনাদের ভাল নাও লাগতে পারে।'

নীরা এবার সহসা কিছু বলল না। ব্রজকিশোরও না। দুজনেই একটুখানি সময় চুপচাপ। সেই ফাঁকে বিজিত আবার বলল, সাধারণতঃ সবাই যা করেন, আর যেটা সব দিক থেকে মানানসই দেখায়, আপনারা সেই মতোই তো সব করছেন, ঠিকই তো আছে।'

তথাপি সেই মুহূর্তেই নীরা কোন কথা বলল না। ব্রজকিশোরও না। অথচ নীরার মন বলছে, বিজিত যেন ঠিক কথাই বলছে। ওর মন সায় দিচ্ছে। কিন্তু বিজিতের মধ্যে যে এরকম একটা বিরোধী মনোভাব আছে, কখনও জানা যায় নি। বরং এরকম ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ সরকার ঘেঁসা হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সহায়তা বা সমর্থন পেতে চায়। তাতে অনেক সুবিধা। ব্রজকিশোর সেইভাবে চিন্তা করতেই অভ্যস্ত। ইতিপূর্বে মধুসূদন বেঁচে থাকতে, নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বা নেতারা নিমন্ত্রিত হয়েছে। তাঁদের অনেকের সঙ্গে মধুসূদনের ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল।

নীরা মনে মনে বিজিতকে সমর্থন করলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। ব্রজকিশোর কী বলেন, সেটাই ও শুনতে চায় এবং প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে ব্রজকিশোর যা পরামর্শ দেবেন, নীরা কার্যতঃ সেটাই অনুমোদন করবে। ও ব্রজকিশোরের দিকে তাকাল। ব্রজকিশোর দ্বিধায় পড়েছেন বোঝাই যাচ্ছে। বিজিতের ইচ্ছা তিনি ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বিজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী ভেবে এ কথা বলছ বল তো? তুমি কি কোন রাজনৈতিক নেতার সম্পর্কেই একথা বলছ?'

বিজিত একটু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু এ নিয়ে ভাববেন না। যা মনস্থ করেছেন তা-ই করুন।'

ব্রজকিশোর বললেন, 'তা কেন বিজিত? তুমি যখন এ রকম ভাবছ, তখন আমাদেরও ভাবা উচিত, কী বল নীরা?'

নীরা নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে বলল, 'এ বিষয়ে আমার

কিছু বলার নেই বোসকাকা। সবাই মিলে যা ডিসাইড করবেন তাই হবে। তবে আমি বিজিতবাবুর কাছে জানতে চাইছি, মন্ত্রী বা নেতা না হলে অন্য আর কীভাবে কী করা যায়?

ব্রজকিশোর বলে উঠলেন, একজাক্‌টলি, আমিও সেটাই বিজিতের কাছে জানতে চাইছি। বিজিত, তোমার কি অলটারনেটিভ কিছু মাথায় আছে?

বিজিত একটু হেসে বলল, ওরভিয়াসলি, অন্যরকম একটা চিন্তা আমার মাথায় আছে। আমি ভাবছিলাম, দেশের এমন কোন ব্যক্তি কারখানার দ্বারোদ্‌ঘাটন করুন যিনি নিজের চেষ্টায় কষ্ট করে কারখানা তৈরী করেছেন, জীবনে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সার্থক হয়েছেন। অর্থাৎ যিনি বোঝেন, একটা কারখানা তৈরী করার ব্যাপারটা কী। এরকম দু-চারজন ব্যক্তি আমাদের দেশে আছেন, দেশের মানুষ যাঁদের শ্রদ্ধা করে। রাজনৈতিক নেতারা বা মন্ত্রীরা এসব ব্যাপারে নিতান্তই বাইরের লোক, তাঁরা এসব বোঝেন না। উৎপাদন, অর্থনীতির ওপর তাঁদের সে দৃষ্টিভঙ্গীও নেই। নিতান্ত পদমর্যাদা আর নামের জোরেই তাঁরা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, আমার বলার উদ্দেশ্য এ-ই।'

নীরা বিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সে যখন কথা বলছিল, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে তার সুচিন্তিত দৃঢ়তা এবং মুখের ভাবে একটা প্রত্যয় ফুটে উঠছিল। সে কী বলছে, তা সে জানে, তার বিশ্বাস থেকেই বলছে। নীরা তাকে মনে মনে সমর্থন করলেও, ব্রজকিশোরের জবাব শোনবার জন্য তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। ব্রজকিশোর এক কথাতেই সায় দিয়ে বললেন, যথার্থ বলেছ, ঠিক বলেছ, কোন সন্দেহ নেই। আমরা এঁদের ডাকি কেন, নেহাৎ নিজেদের কিছু সুবিধার কথা ভেবে। কেননা, সময় বিশেষে এঁরাও নানান সুবিধার জন্য আমাদের কাছে আসে। যাই হোক, সে আলোচনায়

গিয়ে আমাদের দরকার নেই। তা হলে ঠিক করে ফেলা যাক, আমরা কাকে আনতে পারি। তুমি কি কারোর কথা ভেবেছ বিজিত ?'

বিজিত ব্রজকিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেটা আপনিও ঠিক করতে পারেন। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আপনি আমার থেকে বেশি জানেন।'

ব্রজকিশোর কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'তুমি যে রকম বলছ, সে রকম দেখতে গেলে, রাজনারায়ণ চৌধুরী মশায়ের কথাই আমার আগে মনে আসছে। ওঁর অবিশ্যি যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আজকাল কোথাও বিশেষ বেরোন না।'

বিজিত বলে উঠলো, 'খুব ভাল হয়। আর. এন. চৌধুরীকে পেলে তো কোন কথাই নেই। উনিই সব থেকে উপযুক্ত লোক। আমি ওঁর জীবনী কিছু কিছু পড়েছি। মাত্র সতের বছর বয়স থেকে নিজের চেষ্টায় এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা তৈরী করতে চেয়েছিলেন। বহু পরিশ্রম করে, মধ্য বয়সে তিনি আর. এন. চৌধুরী হতে পেরেছিলেন।'

নীরা বললো, 'ওঁকে আমি আমাদের বাড়ীতে একবার দেখেছি। বাবাকে খুব ভালবাসতেন।'

ব্রজকিশোরের একটি নিশ্বাস পড়লো, বললেন, 'হ্যাঁ, মধুসূদনকে খুবই স্নেহ করতেন। তোমার বাবার থেকেও উনি বয়সে বড়।'

নীরা বললো, 'বোসকাকা, তাহলে এই ব্যবস্থাই করুন। উনিই আমাদের নতুন কারখানার দ্বারোদ্‌ঘাটন করুন। সেটাই সব দিক থেকে ভালো হবে। বাবার আত্মাও শান্তি পাবে।'

ব্রজকিশোর বললেন, 'বেশ। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে কে যাবে ? আমি যেতে পারি। তবে তুমিও আমার সঙ্গে যেও।'

নীরা বললো, 'নিশ্চয়ই, আপনি বললেই যাব।'

ব্রজকিশোর বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি গেলে উনি খুশি হবেন।'

বলে, বিজিতের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'এখন দেখছ বিজিত, তুমি মুখ না খুললে কী হত? এড়িয়ে গেলে খুবই অন্যায় করতে। একটা ভালো কাজ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।'

বিজিত একটু লজ্জিত হেসে একবার নীরাকে দেখল। বললো 'আমার প্রস্তাবটা আপনাদের কেমন লাগবে তাই ভাবছিলাম।'

নীরা জবাব দিল, 'আমাদের যে খুব ভালো লেগেছে, তা বোধহয় এখন বুঝতে পারছেন।'

বিজিত এ কথার কোন জবাব দিল না। বললো, 'তবে মন্ত্রী বা নেতাদের নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করবেন।'

ব্রজকিশোর বললেন, 'সেটা তো স্বাভাবিক নিয়ম মাফিকই হবে। সমস্ত ভি. আই. পি-দের নিমন্ত্রণ করা হবে। এখন বলতো, মধুসূদনের মূর্তি উন্মোচন করবেন কে? আর. এন. চৌধুরি?'

বিজিতের মুখে অল্প হাসি। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, 'এসব ক্ষেত্রে পাবলিসিটির খানিকটা দরকার আছে বটে। কিন্তু আমি আবার সেভাবে দেখি না। এ পাবলিসিটির খুব একটা মূল্য আছে বলে মনে হয় না। কোনো নির্লোভ সৎ মধুসূদন রায়ের অন্তরঙ্গ, মূর্তি উন্মোচন করতে পারেন। আর সেটা—।'

বিজিত থেমে গেল। নীরা এবং ব্রজকিশোর দু'জনেই তার দিকে তাকালেন। বিজিত ব্রজকিশোরের দিকে চেয়ে বললো,

'আপনি করলেই ভালো হয়।'

'আমি?'

ব্রজকিশোর বিস্ময়ে এবং প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন।

বিজিতের সঙ্গে নীরার চোখাচোখি হল। বিজিত বললো, 'আমি তো মনে করি, আপনিই সেই ব্যক্তি, যিনি মধুসূদন রায়ের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, বিশ্বস্ত। তাঁর পরে যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি হলেন আপনি। আপনি ছিলেন তাঁর বন্ধু, তাঁর

চিন্তা ভাবনার অংশীদার। বাইরের নাকরা অতিথিতে আমাদের কী দরকার।'

ব্রজকিশোর তথাপি মাথা নাড়ছিলেন, এবং বারে বারেই কিছু বলবার চেষ্টা করছিলেন। আর নীরাকে বিজিত কখনো এত মুগ্ধ করতে পারে নি। এ মুহূর্তে ও বিজিতের দিক থেকে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। একদিকে ব্রজকিশোরের নাম করবার আকস্মিকতার আনন্দ এবং বিজিতের প্রতি মুগ্ধতায় মনে মনে কেমন একটা উত্তেজনা বোধ করছে। বললো, 'এর থেকে আর ভালো, সুন্দর এবং উপযুক্ত কিছু হয় না। বিজিতবাবু আপনাকে সত্যি ধন্যবাদ।'

ব্রজকিশোর বলে উঠলেন, 'না, না, নীরা মা শোন—।'

'কোন কথা শুনব না বোসকাকা। এ আমার পুণ্যি।'

ব্রজকিশোর সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। টেবিলের দিকে মাথা নিচু করে রইলেন। নীরার সঙ্গে বিজিতের দৃষ্টি বিনিময় হল। নীরার উজ্জ্বল চোখের তারা ঝিকমিক করছে। ব্রজকিশোরের অস্ফুট স্খলিত গলা শোনা গেল, 'মধুসূদনের পাথরের মুখ আমি উন্মোচন করব। সে আমার বড় সম্মান, বড় আনন্দ···কিন্তু···কিন্তু বুড়োকে তোমরা কাঁদিয়ে দিলে।'···

বলতে বলতেই ব্রজকিশোর উঠে দাঁড়ালেন, দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখের কোণে জল চিক চিক করছে। নীরা ডাকলো, 'বোসকাকা।'

ব্রজকিশোর মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'একটু পরে আসছি মা, একটু পরেই আসছি।'

বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নীরার সঙ্গে আবার বিজিতের দৃষ্টি বিনিময় হল। বিজিত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আগেই, নীরা বললো, 'সত্যি বিজিতবাবু, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না।'

বিজিত বললো, 'ধন্যবাদের কী আছে। আমার সত্যিকারের যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি।'

নীরা যেন বিজিতের কথা শুনলই না, বললো, 'হয়তো এ কথা কোন দিনই আমার মাথায় আসতো না। কিন্তু আপনি যখন বললেন, মনে হল, আমার মনের ঘুমন্ত কথাগুলোকে আপনি জাগিয়ে তুলছেন। আশ্চর্য, আমি এত সুখী হয়েছি। সত্যি, নির্লোভ, বিশ্বস্ত, বাবার অন্তরঙ্গ, মানুষ হিসাবে বোসকাকা মহৎ। আমরা আমাদের কাছের জিনিস দেখতে পাই না, অভাবে পড়ে দূরে হাতড়ে বেড়াই। কী করে আপনার মাথায় এল বলুন তো?'

বিজিত হেসে উঠলো। বললো, 'কী করে আবার, স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা করতে গিয়ে মনে এল।'

নীরা বললো, 'কিন্তু আমার মনে তো এসব আসে না? আপনার মাথায় কি সব সময় এসব ঘোরে নাকি?'

বিজিত একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'না, আমার অন্যান্য কাজও তো আছে।'

নীরার ভ্রু কুঁচকে উঠলো। বিজিত মুখ টিপে একটু হাসলো। নীরা বললো, 'সে আমি জানি, আপনার অনেক কাজের চিন্তা আছে। আমার এক এক সময় কী মনে হয় জানেন? আপনি যেন আমাকে জব্দ করার জন্যই হঠাৎ এরকম আশ্চর্য এক একটা কথা বলেন।'

বিজিত অবাক হয়ে বললো, 'তার মানে?'

'তার মানে, তা না হলে আপনার মাথাতেই কেবল এ সব কথা আসে কেন?'

বিজিত এবার স্থান কাল ভুলে হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে উঠে বললো, 'সরি ম্যাডাম, সরি।'

নীরা নিজেও তখন মুখ নামিয়ে নিয়েছে। হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। যদিও সেটা বিজিতকে জানতে দিতে চায় না। তা না

চাক। বিশ্ব-সংসারের প্রকৃতি তার এমনরূপেই চলমান, তাকে সব সময়েই সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হয় না। এ মুহূর্তে, বিজিত নিজেও যেন হঠাৎ কেমন বদলে যায়! তার মুখের চেহারা বদলে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো। 'আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি, দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। তা হলে, পয়লা বৈশাখ, আই মীন, ফিপটিন্থ্ এপ্রিল টারগেট করেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি।'

নীরা জবাব দিতে একটু দেরী করল। এখন ওর বুকের কাছে ব্যাথা করছে। ব্যথাটা বেশ কিছু দিন থেকেই ও অনুভব করছে। ওর ডান দিকের বুকের, ডান দিক ঘেঁষে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, ব্যথাটা যেন জোরে বাজছে। ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, ব্যথাটা কেমন। বলা যায় না, যেন একটি বিস্ফোটক। অথচ টনটনানি সেইরকম। একটা মৃদু ব্যথা সব সময়ে লেগে থাকেই। যেন মনে হয়, স্তনের ডান পাশে, কোন কারণে আঘাত লেগেছে, (যদিও কখনো লাগে নি) এবং তার জন্য ব্যথা করছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ সেই ব্যথা তীব্র হয়ে উঠে। এখন, এই মুহূর্তে, ব্যথাটা সেইরকম তীব্র মনে হচ্ছে। ওর লজ্জিত নত মুখে হাসি ছিল। কিন্তু হাসি রাখা সম্ভব হল না। কোন রকমে বললো, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বাঙলা বৎসরের প্রথম দিনই আমাদের দিন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করুন।'

বিজিত চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও, থমকে দাঁড়ালো। নীরার দিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'মিস রায়, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?'

নীরা সেই মুহূর্তেই কোন জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রেখেই চুপ করে রইলো। ওর এক হাত বুকের কাছে। আর এক হাত টেবিলের ওপর এলিয়ে দেওয়া। বুকের ওপর হাতটা ক্রমাগত চেপে বসতে বসতে, আস্তে আস্তে শিথিল হল। এবং আস্তে আস্তে হাতটি টেবিলের ওপরে নেমে এল। ক্লান্ত স্বর শোনা গেল, 'না, কোন কষ্ট

হচ্ছে না বিজিতবাবু আপনি যান। দয়া করে আমার ড্রাইভারকে ডেকে দিন, বলুন, আমি এখনই বাড়ি যেতে চাই।'

বিজিত দ্রুত বেরিয়ে গেল। নীরার ঘরে ড্রাইভার ঢুকে সেলাম দিল। নীরা চেয়ার থেকে উঠে বললো, বাড়ি যাবো।'

ড্রাইভার বললো, 'জী মেমসাব।'

নীরা চেয়ার ছেড়ে ওঠবার আগেই, ড্রাইভার বেরিয়ে গেল। নীরা দেখতে পেল না, বিজিত ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ নীরা এই মুহূর্তে ভাবছে, বিজিত কোথায় গেল। বিজিত কি ওকে বিদায় দিতে পারতো না?

নীরা গাড়িতে উঠে বললো, 'বাড়ি চল।'

গাড়ি এগিয়ে চললো।

শুভ নববর্ষ, আজ বৈশাখের প্রথম দিন। আজ 'মধুসূদন হেভি ইলেকট্রিকাল ওয়ার্কর্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন। আজ থেকে কারখানায় প্রথম উৎপাদন শুরু। পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট হিসাবে বেলা সাড়ে দশটায় প্রথম বৈদ্যুতিক এঞ্জিনের সুইচ অন্ করা হবে এবং তা করবেন আর. এন. চৌধুরি। নতুন কারখানার হুইসল্‌ও তখনই বাজবে। শ্রমিক কর্মচারিদের প্রতি সেই রকম নির্দেশ দেওয়া আছে।

মধুসূদনের মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানও আজই। কারখানার দ্বারোদ্‌ঘাটনের আগে উন্মোচন অনুষ্ঠান। অতিথি অভ্যাগতরা সকালবেলাই চলে এসেছেন। কারখানার কর্মচারি ও শ্রমিকদের উপস্থিতিতে একটি ছোট মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হল, নতুন অফিস বিল্ডিং-এর সামনের বাগানে। বাগানের মাঝখানে মধুসূদনের আবক্ষ মর্মর মূর্তি। আর. এন. চৌধুরির পৌরহিত্যে, ব্রজকিশোর সজল চোখে, মূর্তি উন্মোচন করলেন।

নীরা দাঁড়িয়েছিল আর. এন এর পাশে। আর. এন পলিতকেশ সৌম বৃদ্ধ। নীরার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন মুর্তির সামনে। বললেন, 'ঈশ্বরের কি বিচার দেখেছ মা? আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে, মধুটা কোথায় চলে গিয়েছে।'

নীরার বুকের কাছে টনটন করছে। কেবল স্মৃতির শোকে না। একটা মাংসল ব্যথাও বটে। ব্রজকিশোর সরে এসে দাঁড়াতে, আর. এন তাঁর আর এক হাতে, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। ডাকলেন, 'এস ব্রজকিশোর, আমরা সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে বসি।'

মুর্তি উন্মোচনের পরে, সকলেই আবার আসন গ্রহণ করলেন। আর. এন ব্রজকিশোরকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। নিয়মানুযায়ী ব্রজকিশোর সামান্যই বললেন। যেটুকু বললেন, সবই মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে।

তারপরেই আরম্ভ হল দ্বারোদ্‌ঘাটনের অনুষ্ঠান। এখন বিজিতের ব্যস্ততাই সব থেকে বেশি। আর. এন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, কারখানার পদস্থ অফিসার, এঞ্জিনীয়র, সবাইকে নিয়ে সে অপারেটিং রুমে গেল। একজন তরুণ এঞ্জিনীয়রকে সে আগেই বলে রেখেছিল, সে হুইসল্‌-এর সুইচ টিপবে। যথারীতি তাই হল। নতুন কারখানার বাঁশি বেজে উঠলো। তারপরেই আধুনিক যন্ত্রের যে বিশেষ বোতামটি টিপলে, সমস্ত মেশিন-শপগুলোতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, যন্ত্রের নির্ঘোষ শুরু হবে, যন্ত্র উৎপাদন শুরু করবে, সেই বিশেষ বোতামটি, আর. এন-কে বিজিত দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'স্যার, এই সুইচটা আপনি অন করলে, জেনারেটারগুলো কাজ শুরু করবে।'

আর. এন মুগ্ধ বিস্ময়ে, আধুনিক যন্ত্র দেখছিলেন। বললেন, 'মানুষের কীর্তির কোন তুলনা নেই। অপূর্ব! মানুষ কতো কী গড়ে, আবার ভাঙেও। মানুষের চেয়ে নতুন কিছু নেই, পুরনোও কিছু নেই। মানুষই সব।'......

একজন আর. এন-এর কথাগুলো টেপ করছিল। সেখানে মাইকও ছিল। আর. এন পাশে তাকিয়ে, নীরার দিকে চেয়ে বললেন, 'তা হলে মা চালিয়ে দিই?'

নীরার চোখে জল এসে পড়েছে। ঘাড় কাত করে বললো, 'হ্যাঁ দিন।'

আর. এন বোতাম টিপলেন। কারখানার যন্ত্র নির্ঘোষ শোনা গেল। বিজিত তাড়াতাড়ি মাইকের স্পীকার আর. এন-এর সামনে এগিয়ে দিল। আর. এন বক্তৃতা শুরু করলেন। নীরা সকলের আড়ালে, এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে, অফিস বিল্ডিং-এ ওর নিজের কামরায় গিয়ে, চেয়ারে বসে, টেবিলে মাথা লুটিয়ে দিল। একটা তীব্র গভীর কান্না ও কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। যদিও এই কান্নাটা কেবল শোকের না। এর মধ্যে আনন্দও আছে। এই নিরালা কামরায়, ও ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'বাবা, তুমি সুখী হয়েছ তো? শান্তি পাচ্ছ তো।'......

ডান দিকের বুকের, ডান দিক ঘেঁষে ব্যথাটা রোজই, প্রায় সব সময়ে অনুভব করছে। মাসখানেক আগে, মাঝে মধ্যে ব্যথাটা বোধ হতো। এখন রোজ এবং প্রায় সর্বদাই। আজ যেন ব্যথাটা আরো তীব্র। ডান স্তনের গায়ে হাত দিয়ে, ডান পাশে ও যেন শক্ত মতো কিছু একটা অনুভব করেছে। কবে থেকে এরকম শক্ত হয়েছে, ও জানে না। নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে, মনে হয়েছে, স্তনের সেই বিশেষ অংশটির রঙ যেন একটু রক্তিম। ব্যথার তীব্রতা আজ ওকে কাজ করতে দিচ্ছে না।

নীরা ব্রজকিশোরকে জানিয়ে বাড়ি চলে এল। পারিবারিক ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল। ডক্টর ঘোষ এসে সব শুনলেন। বেশ কিছুক্ষণ

ধরে ভাবলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কবে হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। ব্যথার ধরণটা কেমন, শুনলেন। তারপর বললেন, ভয়ের কিছু নেই, তবে একবার বায়োপ্‌সি করে দেখে নেওয়াই ভাল। আপাতত আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে যাও। আগামীকালই তোমাকে নিয়ে আমি একবার হাসপাতালে যাব।

নীরা ঠিক ভয় পেল না, একটু চিন্তিত হল। পরের দিন ডক্টর ঘোষ ওকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। বায়োপ্‌সি করিয়ে নিয়ে এলেন। নীরা জানাল, ওষুধটা খেয়ে ব্যথা একটু কম আছে। তবে তার জন্য ও অফিস কামাই করল না। এমন কি পঁচিশ মাইল দূরে নতুন কারখানায়ও ঘুরে এল।

পরের দিন বায়োপ্‌সি রিপোর্ট পাবার কথা। ডক্টর ঘোষ নিজেই নিয়ে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যেয় এলেন না। সারাদিন কোন খবরও দেননি। নীরা সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারকে ফোন করল। শুনল, তিনি বাড়ি নেই। তার পরের দিন অফিসে যাবার পথে নীরা নিজেই হাসপাতালে গেল। সৌভাগ্যক্রমে যে ডাক্তার ওর বায়োপ্‌সি করিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গেই দেখা হয় গেল। নীরাকে দেখে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর মিস্ রায়?'

নীরা বলল, 'খবর তো নেবার জন্যই এলাম আপনার কাছে। গতকাল আমার বায়োপ্‌সির রিপোর্টটা পাবার কথা ছিল, পাই নি।'

ডাক্তার একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ডক্টর ঘোষ তো রিপোর্ট নিয়ে গেছেন।'

নীরা অবাক চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালো। ডাক্তার আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ডক্টর ঘোষ হয় তো কোন কাজে আটকে পড়েছেন, তাই আপনাকে জানাতে পারেন নি। আজই হয় তো যাবেন।'

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই নীরার চোখে ও মনে তীক্ষ্ণ একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। এবং এক মুহূর্তের জন্য ওর সমস্ত অনুভূতি যেন ডান দিকের বুকের ডান পাশে কেন্দ্রিভূত হল। কিছু না বলে, ও ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তারের মুখও আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'আপনি আমার ঘরটা চেনেন তো। সেখানে গিয়ে দু' মিনিট বসুন, আমি আসছি।'

নীরা ডাক্তারের ঘরে গিয়ে বসল। মৃত্যুভয়ের অনুভূতি কেমন, নীরা তা জানে না। তথাপি মনে হল, ওর সমস্ত স্নায়ু যেন কাঁপছে। নিশ্বাস থমকে আসছে বুকের কাছে। অথচ সমস্ত চেতনা যেন অবশ হয়ে আসছে। ওর চোখের সামনে বাবা, মীরার মুখ, সমস্ত বাড়িটা, অফিস, কারখানা, নতুন কারখানা ভাসছে। বিজিত এই সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে, একটা ইম্‌পোজ করা ছবির মতো ভেসে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ওর হাত, ডান দিকের স্তনে স্পর্শ করলো। ব্যথার জায়গা, যেখানে ছোট একটি টিউমার রয়েছে, সেখানে আল্‌গোছে আঙুল ছোঁয়ালো। ব্যথা, তীব্র একটা ব্যথা এখানে। পুরুষের স্পর্শ মাত্রই যদি নারীর কুমারীত্ব চলে যায়, তবে নীরা কুমারী নয়। অন্যথায় এ বুক এখনো কুমারীর, এ বুকে এখনো অনেক মানবী-আশা।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে পিছন থেকে বলে উঠলেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

নীরা সংবিত ফিরে পেল। বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এল, এবং নিজের চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মনকে শক্ত করল। যে কোন দুঃসংবাদ শোনবার জন্য ও নিজেকে প্রস্তুত করল।

ডাক্তার এসে ওর মুখোমুখি বসলেন। কিন্তু সহসা কোন কথা বলতে পারলেন না। যেন কী বলবেন, স্থির করতে পারছেন না। নীরা ডাক্তারের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি

ফ্র্যাংকলি সব কথা বলতে পারেন। যদিও আমি খানিকটা অনুমান করতে পারছি। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আমার মন দুর্বল নয়।'

মধ্যবয়স্ক ডাক্তার করুণভাবে হেসে উঠে বললেন, 'মিস রায়, আপনি আমাকে বলছেন বয়সের কথা। মনে হয় আমার বড় মেয়েটি আপনার থেকে ছোট নয়। ও কথাটা আপনি বলবেন না।'

নীরা বলল, 'ঠিক বয়সের কথা বলতে চাই নি। বলতে চাই, এই বয়সের মধ্যেই, অনেক মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে, তার নির্মম পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। আপনি আমাকে মন খুলে বলুন।'

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে গম্ভীর মুখেই একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'আমি জানি মিস রয়। আপনি যথেষ্ট দায়িত্বের কাজ নিয়ে থাকেন। আপনাব অভিজ্ঞতা অনেক। আপনাকে আমি কোন কথা লুকোতে চাই না। আপনার জীবনে কি খুব বড় কাজ বাকী আছে?'

নীরা জিজ্ঞেস করল, 'একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন। আমি কি আব বেশি দিন বাঁচব না?'

ডাক্তার আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'যা করবার, মাস আটেকের মধ্যে শেষ করুন।'

চকিতের জন্য নীরার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল। নিশ্বাস নিতে পারল না। তাহলে সেই প্রাণঘাতী ব্যাধি ওর দেহে এসেছে, ক্যান্সার!

এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির নাম, নীরা কখনো উচ্চারণ করতে চায় নি। যখন থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করেছে, তখনো ওর মনে কোন কুটিল প্রশ্ন জাগে নি। ডক্টর ঘোষ ওদের পারিবারিক ডাক্তার। তিনি ওর আঁচল ঢাকা বুকে হাত দিয়ে দেখবার সময় যখন গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন, নীরার মনে কোন ভয়ংকর জিজ্ঞাসা দেখা দেয় নি। বরং

একটা অপরিসীম লজ্জায়, মুখ লাল করে, চোখ বুজেছিল। তারপরে ডক্টর ঘোষ যখন বললেন বায়োপ্‌সি করানোর কথা, সেই মুহূর্তে ওর বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠেছিল। ব্যাধিটির নাম উচ্চারণ করে নি, কিন্তু মনের মধ্যে জেগেছিল।

এখনো ডাক্তার উচ্চারণ করলেন না, নীরাও না। অথচ ওর বুকের স্পন্দনের তালে তালে বাজছে, ক্যান্সার, ক্যান্সার। যে-ব্যাধির কার্য কারণ আজ অবধি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নি। নীরার চোখের সামনে যেন সব কালো হয়ে গেল। মনে হল, মৃত্যুর গাঢ় গভীর অন্ধকার বুকে ও শুয়ে আছে।

নীরা শুনতে পেল, যেন বহু দূর থেকে ওকে কেউ ডাকছেন, 'মিস্ রায়, মিস্ রায়।'

নীরা সেই ডাক শুনে, আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকালো। যেন ফিরে এল বহু দূর থেকে, এবং সামনে ডাক্তারের মুখ দেখতে পেল। ডাক্তার বললেন, 'মিস রায়, আমার কথাগুলো বোধহয় ঠিকভাবে বলা হয় নি। আপনার মতো শক্তিমতী মেয়ে বলেই, আমি চরম এবং সম্ভাব্য পরিণতির কথাটা বলে ফেলেছি।'

ডাক্তারের 'শক্তিমতী' কথাটা যেন নীরার অন্ধকার মনে এক ঝলক আলো ছড়িয়ে দিল। শক্তি চায় নীরা, শক্তি চায়, শক্তিমতী হতে চায়। মনে মনে বলল, 'শক্তি দাও হে ঈশ্বর। বাবা, আমাকে শক্তি দাও। মীরা, ভাই আমাকে শক্তি দে। বিজিত—।'

বিজিতের নামটা মনে আসতেই ও একবার থমকে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ বিজিত, তুমিও আমাকে শক্তি দাও। আর তোমাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কি আমার আছে। আমার এই প্রাণঘাতী ব্যাধি যেমন আমাকে না জানিয়েই মৃত্যু চক্র গড়ে তুলেছে, তেমনি কবে থেকে যেন আমাকে আমার নিজের হৃদয় জানতে না দিয়ে একটি তাজা ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে। তুই-ই না জানিয়ে এসেছে।

কিন্তু আমার পরাজয় মৃত্যুর কাছে না। আমার ভিতরে এখন ফুলের রঙ, এখন আমার জীবনে ফুল ফোটার সমারোহ। আমি শক্তিমতী, শক্তি আমার প্রাণ ভরা।'

আস্তে আস্তে ওর মুখে রক্ত ফিরে এল। রক্তিম ঠোঁটে হাসি ফুটল। বলল, 'না ডাক্তারবাবু, আপনি কিছু ভুল বলেন নি। তবু মানুষের মন, একটু যে বিচলিত হয়ে পড়ি নি, তা বলতে পারব না। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাটা যেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর আমার সে ভয় নেই। আপনাকে তো বলেছি, অনেক মর্মান্তিক নিষ্ঠুর ঘটনার পরিণতি আমি ভোগ করেছি। আপনি যদি এতোটা সহজ সোজা ভাবে আমাকে না বলতেন, তা হলে আমি হয়তো মিথ্যা আশায়, আমার অনেক করণীয় কাজই করে যেতে পারতাম না।'

ডাক্তার বললেন, 'তবু মিস রায়, এখন আমার অনুশোচনাই হচ্ছে। কথাটা ও ভাবে না বললেই বোধহয় ভালো করতাম।'

নীরা মাথা নেড়ে বললো, 'না ডাক্তারবাবু, তা নয়। আপনি তো আমাকে শক্তিমতী বলেছেন।'

এবার ডাক্তারের গলাটা যেন ধরে এল। বললেন, 'হ্যাঁ মা, আপনাকে আমি শক্তিমতী বলেই জানি।'

নীরা ডাক্তারের স্নেহকরুণ চোখের দিকে দেখলো, বুকটা কেন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। বলল, 'সেইজন্য আপনার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। কৃতজ্ঞ থাকব, আপনি আমাকে সোজা সরল সত্যি কথা বলেছেন। আমি জানি, অনেকের কাছে আপনার কথা হয় তো নিষ্ঠুর মনে হবে। আমার তা কোনদিন হবে না।'

ডাক্তার স্নেহাভিভূত চোখে এক মুহূর্ত নীরাকে দেখলেন। বললেন, 'কিন্তু মিস রায়, পৃথিবীতে বহু বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে, যখন দেখা যায়, বিজ্ঞানও যুক্তি দিয়ে তার বিচার করতে পারে না। ক্যান্সারের এমন রুগীও দেখেছি, আমরা যার মৃত্যু ঘোষণা করেছি, জানি তার আয়ু আর

মাত্র এক মাস, সেই রুগীই বহাল তবিয়তে দশ বছর ধরে বেঁচে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে।'

নীরা হেসে উঠলো। বলল, 'হয় তো তেমন অঘটন চির দিনই কিছু কিছু ঘটে। কিন্তু সেই অঘটনের মুখ চেয়ে আপনি আমাকে থাকতে বলবেন না।'

ডাক্তার বললেন, 'তা বলব না। কিন্তু প্রার্থনা করব, আপনার জীবনে যেন সেরকম অঘটন ঘটে।'

নীরা হাসল, এ বিষয়ে কিছু বলল না। ও বললো, 'ডাক্তারবাবু, ব্যথাটা কমতে পারে। সেরকম কোন ওষুধ কি আছে।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি তো ডক্টর ঘোষকে প্রেসক্রাইব করে দিয়েছি। বিশেষ করে ব্যথাটা যাতে কম থাকে, তার জন্য একটা ওষুধ দিয়েছি। তা ছাড়া আপনাকে হসপিটালাইজ করার নির্দেশও ওতে দেওয়া আছে।'

নীরা বলল, 'হাসপাতালে আর আসতে চাই না ডাক্তারবাবু। আমাকে এখানে এনে শুইয়ে রাখবেন না।'

ডাক্তার বললেন, 'অবিশ্যি ইনজেকশনের নির্দেশ দেওয়া আছে। সেটা ডক্টর ঘোষই দেবেন। কিন্তু মাঝে মাঝে রেডিওথেরাপির দরকার আছে। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে না পড়লে, সেটা আপনি এসেও নিয়ে যেতে পারেন।'

নীরা বলল, 'তাই করব। আমি তা হলে এখন চলি।'

'আসুন।' ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গে ঘরের বাইরে পর্যন্ত এলেন।

নীরা হাসপাতালের বাইরে এল। রৌদ্র উজ্জ্বল শহরটাকে যেন ওর নতুন লাগছে। কেমন করে যেন, ওর চোখে শহরটা বদলে গিয়েছে। ও গাড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই, ড্রাইভার তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল। এটাই বরাবরের নিয়ম। তবু আজ নীরা ড্রাইভারে নাম করে

বলে উঠলো, 'থাক না বিষ্ণু, আমি নিজেই তো দরজা খুলে বসতে পারি।'

ড্রাইভার বিষ্ণু একটু অবাক হলেও, মুখে কিছু বলল না। নীরা ভিতরে বসবার পরে, দরজা বন্ধ করে, সামনে গিয়ে গাড়িতে বসল।

নীরা বলল, 'অফিসে চল।'

নীরা সোজা অফিসে এল। সারাদিন কাজ করল। বিভিন্ন অফিসার কর্মচারীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলল, আলোচনা করল। তবু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, অথচ বিশেষ কিছু ভাবতে পারছে না। কেবল বিজিতের মুখটা মনে পড়তে লাগল। ও জানে বিজিত ওর জন্য পথ চেয়ে থাকবে। সন্ধ্যেবেলায় ও নতুন কারখানায় যাবে। বিজিত এখন সেখানেই আছে। নতুন কারখানার সে চীফ এঞ্জিনীয়র।

কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না। চারটের সময় নীরা টেলিফোন করল, ডাকল, 'বিজিত!'

ওপার থেকে বিজিতের বিস্মিত গলা শোনা গেল, 'কে বলছেন?'

নীরা কোনদিন এভাবে ঠিক 'বিজিত' বলে ডাকেনি। আজ ও মিস রয়ের বদলে বলল, 'আমি নীরা বলছি।'

বিজিতের গলায় উপুর্যপরি বিস্ময় ফুটল, 'ওহ্, হ্যাঁ বলুন।'

নীরা বলল, 'আমি আসছি।'

বিজিত বলল, 'আসুন।'

নীরা আবার বলল, 'আমি রূপনারায়ণের ধারে যাব।'

বিজিত হঠাৎ কোন কথাই বলতে পারল না। একটু থেমে বলল, 'আসুন।'

নীরা রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর কারোকে কিছু না বলে

সোজা নিচে নেমে একেবারে গাড়িতে উঠে বসল। ড্রাইভারকে বলল, 'নতুন কারখানায় চল।'

গাড়ি চলল। নীরা বাইরের দিকে ফিরে তাকাল। গাড়ি ঘোড়া, লোক জন, চলমান জীবনের স্রোত ওর চারপাশে। কত মানুষের কত ভাবনা, কত চিন্তা। সকলের জীবনেই কত ঘটনা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কথাটা এভাবে আর কখনো মনে হয়নি। আর পৃথিবীকে এত ভাল আর কখনো লাগেনি, এত সুন্দর বোধ হয়নি। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বৃথাই জীবনের জটিলতা, যত অসহজ ভাবনা-চিন্তা। জীবন একদিকে চরম নিষ্ঠুর, আর এক দিকে পরম সহজ ও সুন্দর। এ দু'য়ের মাঝে একটা গভীর লীলা যেন খেলা করছে। যবনিকা যখন নামে তখন সর্বাংশে নামে, এক দিকে নামে না। নীরা ভুল ভেবেছিল, এখনো তার বিশেষ কোন একদিকে যবনিকা পড়েনি, সেখানে দৃশ্যের অবতারণা ঘটেই চলেছিল।

নীরা এসে যখন নতুন কারখানায় পৌঁছুল, বিজিত ওর জন্য অফিসের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। নীরা জানে বিজিতের চোখে পরম কৌতূহলিত বিস্মিত জিজ্ঞাসা। এমন করে ও আর কোনদিন নীরার দিকে তাকায়নি। বিজিত প্রায় ছুটে এল ওর গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ধরল। নীরা নেমে এল। বিজিতের দিকে তাকাল। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি কোথায়?'

বিজিত জিজ্ঞেস করল, 'কার, আমার? পিছনে রয়েছে।'

নীরা অনায়াসে বলল, 'নিয়ে এস, আমি তোমার গাড়িতে যাব।'

বিজিতের চোখে বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। কোন ভূমিকা না করেই, এই প্রথম ও বিজিতকে 'তুমি' সম্বোধন করল। কিন্তু বিজিত ভাবাবেগে সহসা কিছু বলবার বা করবার ছেলে না। পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখতে ও ভাবতে চায়। যদিও তার

মুখের রঙ বদলে গিয়েছে। চকিতে একবার নীরার চোখের দিকে দেখে বলল, 'এখুনি নিয়ে আসছি।'

নীরা জানে, কারখানার চারপাশে, অফিস বিল্ডিং থেকে অনেক অদৃশ্য চোখ ওকে দেখছে। সবাই কৌতূহলিত হয়ে অনেক কিছু ভাবছে। ও নিজের ড্রাইভারকে বলল, 'তুমি গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে পরে নিতে আসব ?'

নীরা বলল, 'না। আমি ইঞ্জিনীয়র সাহেবের গাড়িতে বাড়ি চলে যাব।'

ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে চলে গেল। নীরা অফিস বিল্ডিং-এর সামনে, বাগানে মধুসূদনের আবক্ষ শ্বেত পাথরের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মনে হল, মধুসূদন যেন ওর দিকেই স্থির করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। নীরার ঠোঁট নড়ে উঠল, ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, তুমি তো সবই জান, সবই দেখছ। আমাকে শক্তি দাও, আমার এখনো অনেক কাজ বাকী। আর···বাবা, আমি বিজিতের কাছে কী ভাবে ছুটে এলাম, তুমি দেখলে। তুমি আশীর্বাদ কর।'···

পিছনে বিজিতের গলা শোনা গেল, 'মিস রয়।'

নীরার একবার ভুরু কুঁচকে উঠল বিজিতের সম্বোধন শুনে। কিন্তু কিছু বলল না। দেখল, বিজিতের চোখে মুখে এখনো কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। বিজিত বলল, 'গাড়ি এনেছি।'

নীরা বিজিতের সঙ্গে গিয়ে, গাড়িতে উঠে বসল, বলল, 'বিজিত, চল রূপনারায়ণের ধারে যাই।'

বিজিত আবার তাকিয়ে দেখল নীরার দিকে। তার চোখে সেই একই দৃষ্টি। নীরা আজ বিজিতের অনেকখানি কাছ ঘেঁষে বসেছে। বারে বারেই বিজিতের গায়ে স্পর্শ লাগছে। যে স্পর্শের কথা গতকালও নীরা ভাবতে পারতো না। ও বিজিতের দিকে মুখ তুলে বলল, 'এর চেয়ে স্পীডে গাড়ি চালাতে পারো না ?'

বিজিতের আজ বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। বেশি স্পীডে গাড়ি চালাবার জন্য, এই নীরাই তো বিরক্ত হয়েছিল। নীরারও সে কথা মনে আছে। বিজিত তাকালো। দেখলো নীরার ঠোঁটে হাসি, দৃষ্টিতে কৌতূকের ছটা।

বিজিত বলল, 'পারি। আমার ধারণা হয়েছিল, তাতে আপনার আপত্তি আছে।'

নীরা বলল, 'আজ আর আমার কোন আপত্তি নেই, ভয় নেই। তুমি যতো খুশি জোরে চালাও, আমি দুর্বার।'

বিজিত নীরার দিকে দেখল, বলল, 'কিন্তু আজ আমি স্পীড বাড়াতে পারছি না।'

'কেন বিজিত?'

'জানি না।'

'আমি জানি।'

'কেন?' বিজিত আবার নীরার মুখের দিকে তাকাল।

নীরা বলল, 'গাড়ি চালানোর দিকে তোমার মন নেই।'

বিজিত শুধু নীরাকে চেয়ে দেখল, কিছু বলল না। নীরা হাসল। কয়েকবারই বিজিত সামনের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরার দিকে দেখল। আর প্রত্যেকবারই নীরার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, নীরার মুখে সেই হাসি। তারপরে নীরা জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ বিজিত?'

বিজিত বলল, 'কিছু ভাবতে পারছি না। অথচ আমার মনে এত কৌতূহল, এত জিজ্ঞাসা, এত অবাক হচ্ছি, তবু কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না।'

'কেন পারছ না?'

'নানা সংশয়ে।'

'তাতে খুব খারাপ লাগছে না তো?'

'না, কিন্তু কৌতূহল দমন করতেও পারছি না।'

নীরা বলল, 'সংসারে সব কৌতূহল কি মেটে বিজিত ?'

বিজিত বলল, 'কিন্তু আমি যে নিতান্ত বস্তুবাদী মানুষ, যন্ত্র আব বিজ্ঞান নিয়ে আমার কাজ। সব কিছুরই একটা জবাব খুঁজি আমি।'

নীরা বলল, 'সব জবাব কি মেলে ?'

বিজিত নীরার দিকে ফিরে তাকাল। নীরাও তাকাচ্ছিল। হেসে, অনায়াসে বিজিতের কোলের কাছে একটা হাত রাখল। বলল, 'তুমি যে কথার জবাব চাও তা আমার সঠিক জানা নেই। শুধু মনে হল, সব কাজ ফেলে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি, তোমার সঙ্গে রূপনারায়ণের ধারে যাই। বিজিত তোমাকে দুঃখ দিচ্ছি না তো ?'

বিজিতের গাড়িব গতি হঠাৎ একবার কমে গেল, বলল, 'দুঃখ !'

তার কোলের ওপর রাখা নীরার সুন্দর হাতটির দিকে তাকিযে বিজিত বলল, 'জীবনে কখনো কোনদিন এবকম একটা লগ্ন আসবে, এ যে আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।'

নীরা বলল, 'তোমার কী মনে হচ্ছে জানি না কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে পারো, তোমার প্রতি আমার এই আচরণ, আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়েই। নিতান্ত একটি সামান্য মেয়েব মত তোমার কাছে এসেছি, আসব।'

বিজিত অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সামান্য মেয়ে !'

নীরা ঘাড় ঝাঁকিরে বলল, 'সামান্য, অতি সামান্য মেয়ে, যে শুধু তোমার কোলের ওপর হাতটি এমনি করে রেখে বসে থাকতে চায়।'

বিজিত বলল, 'আমি জানি আমার পাশে নয়ন এঞ্জিনিয়ারিং এবং মধুসূদন হেভি ইলেকট্রিকস্-এর প্রোপ্রাইটর ডিরেক্টর বসে আছেন।'

নীরা হেসে বলল, 'শুধু জানো না, সে একটি মেয়ে, যে বিজিত নামে একটি পুরুষের বুকের কাছে নিবিড় হয়ে থাকতে চায়।'

গাড়ির গতি আবার কমে এল। বিজিত আজ এই মুহূর্তে স্টিয়ারিং ঠিক্ রাখতে পারছে না। নীরার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। নীবা

আরো ঘন হয়ে এসেছে। ওর নিশ্বাস লাগছে বিজিতের ঘাড়ে গলায়। বিজিত কথা বলতে পারছে না। নীরা আবার বলল, 'বিজিত তুমি আমাকে আর প্রোপ্রাইটার ডিরেক্টর বলো না। আমাকে তুমি নাম ধরে ডেকো। আমি তোমার কাছে শুধু নীরা।

বিজিত বলল, 'একটু আগেও এমন কথা কল্পনাও করতে পারিনি।'

'কিন্তু মনে মনে কি তুমি আমাকে কখনো নাম ধরে ডাকনি?'

বিজিত নীরাকে একবার দেখে, সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ডেকেছি।'

'এবার থেকে মুখে ডেকো। বিজিত, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'বল।'

'তুমি কি আমাকে ভালবেসেছ, ভালবাসো কি আমাকে?'

নীরার মুখ বিজিতের অনেক কাছে। বিজিতের মুখের কাছে নীরা মুখ তুলে এনেছে। বিজিত রাস্তার নিরালা ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, 'এই মুহূর্তে আমি গাড়ি চালাতে পারছি না। গাড়ি চালিয়ে জবাব দিতে পারছি না।'

'এবার বল।'

'কোনদিন মুখ ফুটে একথা বলতে পারব ভাবিনি।'

'আমিও মনে মনে তাই ভেবেছিলাম, তোমার মুখ থেকে একথা শোনা আমার জীবনে ঘটবে না। কিন্তু বিজিত, আজও ভাবছিলাম, কবে থেকে তোমার কাছে নিজেকে সঁপে বসে আছি, নিজেও জানি না। কাজে অকাজে এমন কি হঠাৎ ঘুম ভেঙেও তোমার কথা মনে হয়েছে। নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু নিজের কাছে নিজেই আমি অসহায়। নিরালায় যে ফুল ফোটে, তাকে কেউ দেখতে পায় না। আমার মধ্যে তেমনি ফুল ফুটেছে।'

বিজিতের একটি শক্ত হাত নীরা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। 'বলল, বিজিত আজ মুখ ফুটে বল।'

বিজিত বলল, 'মুখ ফুটে কি বলব নীরা, এই দিনটির কথা চিন্তা কখনো করিনি, কিন্তু সব সময়ে একটি নাম বুকের মধ্যে বেজেছে। বেজেছে ভয়ে ভয়ে, সম্ভ্রমের সঙ্গে। সেটা তুমি আমার ডিরেক্টর বলে নয়। আমি নিজে কাজ ভালবাসি, তোমার সেই কর্মী রূপকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তারই নাম আমার বুকে আর এক সুরে বাজে। সেই বেজে ওঠাটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি মনে মনে। সেই বেজে ওঠা ধ্বনির নাম যে "ভালবাসা" তা আমি উচ্চারণ করতে সাহস পাই নি। তোমার মতো আমিও কাজের মধ্যে আনমনা হয়েছি। কতো দিন তোমাকে পিছন থেকে দেখে, মন টনটন করে উঠেছে। ইচ্ছা হয়েছে, তোমাকে কাছে টেনে একটু স্নেহ করি।'

নীরা এবার বিজিতের বুকের ওপর একটি হাত তুলে দিয়ে বলল, 'আহ্, কেন কর নি বিজিত, কেন কর নি?'

বিজিত বলল, 'তুমি বুঝতে পারো নীরা, স্বাভাবিক কারণেই পারি নি।'

নীরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বুঝি। তখন যে আমি নিজেকেও চিনতাম না। কিন্তু বিজিত, তোমাকে দেখে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে, আমার বুকের মধ্যে চমকে উঠতো। তোমার চোখের মধ্যে আমি যেন কী দেখতে পেতাম।'

বিজিত বলল, 'সেই বেজে ওঠাটাই দেখতে পেতে। যে কথা মুখ ফুটে বলাতে বলছ, আমার চোখে কি এখন সেই কথা নেই?'

নীরা বিজিতের দিকে তাকাল। নিমেষে ওর মন আবেগে ভরে উঠল। বিজিতের কাঁধের কাছে মাথা ঠেকিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, 'বিজিত, বিজিত।'

একটু পরে নীরার আবেগ শান্ত হলে, আবার বলল, 'তোমার চোখের এই কথাটা পড়া ছিল বলেই, আজ এভাবে ছুটে আসতে পেরেছি। বিজিত, তুমি বাবার বড় প্রিয়, স্নেহের পাত্র ছিলে। তিনি

তোমাকে ছেলের মতো দেখতেন। তুমি আমার কাছে অনেক বড়। বাবার স্বপ্নকে তুমি রূপ দিয়েছে।'

'আমি একলা নই।'

'তবু তুমিই অনেকখানি। আমার মনেও তুমি প্রিয় ছিলে, বলতে পারছিলাম না। পারব, তাও ভাবিনি। আজ পেরেছি, এটাই বড় কথা। বিজিত, তোমার কাছে আমার আর নিজের বলে কিছু রইল না। বিজিত, বিজিত!'

নীরার গলা যেন চুপি চুপি শোনাল। ওর মুখ বিজিতের আরো কাছে। নীরা তেমনি ফিসফিস করে বলল, 'বিজিত আমি বড় কাঙাল, তোমার কাঙাল। আমাকে একটু আদর কর বিজিত।'

বিজিত এক মুহূর্ত নীরার মুখের দিকে দেখল। তারপরে দু'হাতে ওর মুখ তুলে ধরে, আগে ওর কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালো, চোখে বোলালো, তারপরে দুই ঠোঁটে গভীর করে চুমো খেলো। নীরা বিজিতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, চুম্বনের প্রতিটি ঢেউয়ের প্রতিদান দিল। তারপরে বিজিতের বুকের ওপর মাথা রেখে চুপ করে রইল।

একটু পরে বিজিত ডাকল,

'নীরা।'

'উঁ ?'

'এবার চল, বেলা পড়ে আসছে।'

'চল।'

বিজিত গাড়ি স্টার্ট দিল।

ওরা যখন রূপনারায়ণের সেতুতে পৌঁছুল, তখনো বেলা শেষে রাঙা রোদ নদীর বুকে ঝিকমিক করছে। বিজিত আজ গাড়ী নামিয়ে নিয়ে গেল নিচের রাস্তায়, নদীর ধারের কাছাকাছি। গাড়ি রেখে নদী

একেবারে ধারে চলে গেল। যতক্ষণ অন্ধকার না হল, ততক্ষণ নদীর ধারে রইল। নীরা একটু সময়ের জন্যও বিজিতের হাত ছাড়ল না। একবার বলল, 'বিজিত, এতদিন আমার জীবনটা যেন কোথায় আটকে পড়েছিল। আজ হঠাৎ মুক্তি পেয়েছে। আমি এই নদীর মত বইতে চাই, কিন্তু তোমার কূলে কূলে।'

বিজিত জিজ্ঞেস করল, 'আজই হঠাৎ মুক্তি পেল কেমন করে, আমার জানতে ইচ্ছা করছে।'

নীরা একটু চুপ করে রইল। তারপরে বলল, 'এ আমার নিয়তির নির্দেশ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।'

বিজিত ওর শক্ত হাতে নীরার হাত ধরল।

রাত্রি ন'টায় ওরা কলকাতায় ফিরে এল। নীরা বলল, 'তোমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে। চল তোমার মাকে দেখে আসি।'

বিজিত অবাক খুশি গলায় বলল, 'যাবে?'

'কেন যাব না?'

বিজিত উত্তর কলকাতায় ওদের বাড়িতে এল নীরাকে নিয়ে। মায়ের সঙ্গে নীরার পরিচয় করিয়ে দিল। বিজিতের মা শশব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, আসুন আমার কি ভাগ্য।

নীরা বলল, 'আসুন না, এস।'

বলেই নীরা বিজিতের মাকে প্রণাম করল। বিজিতের মা আরো ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। দু'হাতে নীরাকে বুকের কাছে ধরে বললেন, 'আহা, ওকি।'

নীরা বলল, 'মায়ের কাছে কিছুই নয়। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দিন।'

ঠিক যেন ছোট্ট একটি মেয়ে। বিজিতের মা ওকে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করে দিলেন। নীরা ক্ষুধার্ত শিশুর মতো খেলো। আরো খানিকক্ষণ গল্প করল। তারপর আবার বিজিতের সঙ্গে গাড়িতে উঠল।

বিজিত অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। নীরা জিজ্ঞেস করল, ‘কি ভাবছ বিজিত ?’

‘বলব ?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘নীরা, আমি সত্যি সুখ বোধ করছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা উদ্বেগ হচ্ছে।’

‘কেন বিজিত ?’

‘তা জানি না।’

নীরা বিজিতের কাঁধে হাত তুলে দিয়ে বলল, ‘উদ্বেগের কোন কারণ নেই বিজিত, ওসব মনে এনো না।’

নীরাকে নিয়ে বিজিত যখন ওদের বাড়ীতে এল, তখন রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে। নীরা বলল, ‘কাল সময় মত টেলিফোন করব। তোমাকে এখন আর আসতে হবে না, বাড়ি যাও।’

বিজিত চলে গেল। নীরা বাড়ি ঢুকল। সকলেই জেগে আছে, অপেক্ষা করছে। ব্রজকিশোরকে দেখে নীরা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। বলল, ‘বোস কাকা, আপনি বাড়ি যাননি ?’

ব্রজকিশোরের চোখে মুখে উদ্বেগ। বললেন, ‘অফিস থেকে বেরিয়ে তোমার সাথে দেখা করে যাব ভাবছিলাম। তুমি বিজিতের সঙ্গে বেরিয়েছ, এ খবরটা জানি বলেই একটু নিশ্চিন্ত ছিলাম। তুমি তো এত রাত কর না. তাই একটু চিন্তা হচ্ছিল।

নীরা বলল, ‘তা হলে আর দেরি করবেন না, কাকীমা ভাবছেন।’

ব্রজকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার সেই বুকের কাছে ব্যথাটা কেমন আছে ?’

নীরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল, ব্রজকিশোরকে ডক্টর ঘোষ কিছু জানিয়েছেন। নীরা বলল, ‘ওটা ওর নিজের মতই আছে। বোস কাকা, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।’

'কী কথা বল ?'

'এখন না, পরে বলব।'

'বেশ, তাই বলো। আমি কাল সকালে আসব।'

ব্রজকিশোর যাবার জন্য পা বাড়াতেই নীরা বলল, 'বোসকাকা, এখন কাবোকে কিছু বলার দরকার নেই।'

ব্রজকিশোর থমকে দাঁড়ালেন। তার পরেই হঠাৎ সামনেব একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ব্রজকিশোর কাঁদছেন।

নীরা ওঁর কাছে গেল, কাঁধে হাত রাখল, বলল, 'বোসকাকা আমার মনে তা হলে জোর থাকবে কেমন করে ?'

ব্রজকিশোব শিশুর মত ভাঙাস্বরে বললেন, 'আমি যে মা একটুও জোর পাচ্ছি না, আমার চোখের সামনে যে সব অন্ধকার।'

'কিন্তু বোসকাকা, সত্য কঠিন আর ইন্‌এভিটেব্‌ল্ বলে তাকে মেনে নিতেই হয়, এ তো দৈবাদেশ।

'এ আমি কী দেখলাম, আমার সারাটা জীবনে ?'

নীরা বলল, 'মধুসূদন রায়ের সব চিহ্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

আমি যে ভাবতে পারিনা।

নীরা আর কোন কথা বলতে পারল না। ব্রজকিশোর আর একটু বসে থেকে, অন্যমনস্কভাবে শূন্য চোখে তাকিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

নীরা পরদিন সময়মত অফিসে গেল। কিন্তু আজ নীরা সুন্দর করে সেজেছে, যা ও করে না। ডক্টর ঘোষ যা সব ওষুধ দিয়েছেন সেগুলো ঠিক মত খাচ্ছে। ডক্টর ঘোষ সকালবেলা ইনজেকশনও দিয়ে গিয়েছেন। ব্যাথাটা কম না থাকলে, চলাফেরা করা মুশকিল। বেলা বারোটার সময় ও বিজিতকে টেলিফোন করল, বলল, 'বিজিত, আসবে ?'

জবাব এল, 'যাচ্ছি।'

সোয়া একটায় বিজিত এসে পৌঁছুলো। ইতিমধ্যে ব্রজকিশোর কয়েকবারই এসেছেন। নীরাকে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। নীরা যায়নি। বিজিত আসতেই সে বলল, 'চল বিজিত, তু'জনে কোথাও খেয়ে আসি।'

বিজিতের চোখে সেই বিস্ময়ের ছায়াটা একেবারে কেটে যায়নি। বলল, 'বেশ তো, চল।'

নীরা অফিসের মধ্যেই বিজিতের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বিজিত, তোমার ডিরেক্টরের হুকুম, সারাদিন তুমি আজ আমার সঙ্গে থাকবে।'

বিজিত তবু বলল, 'কিন্তু নতুন কারখানার কাজ?'

নীরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি না গেলে কি খুব ক্ষতি হবে?'

'তা নয়। তা হলে, এ্যাসিটান্ট চীফ এ্যাঞ্জিনীয়ারকে ফোনে কয়েকটা কথা বলতে হবে?'

নীরা বলল, 'তাই বলে দাও।'

বিজিত বলল, 'যো হুকুম মেমসাব।'

নীরা তার গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল। বলল, 'মেমসাব কেন, ম্যাডাম বলবে।'

বিজিত বলল, 'তা হলে বলি প্রাণেশ্বরী।'

নীরা আর একবার বিজিতের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল। তারপরে নীরা গেল, ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে। বিজিত নতুন কারখানায় টেলিফোন করল এ্যাসিটান্ট চীফ এঞ্জিনীয়রকে। তাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে দিল। নীরা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বিজিত বলল, 'বোসকাকাকে কিছু বলে যাবে?'

'কেন?'

'হয় তো খোঁজাখুঁজি করবেন।'

নীরা বলল, 'উনি অফিসের লোকের মুখেই শুনবেন, আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি।'

বিজিত হেসে বলল, 'তা বটে, অফিসের সকলের চক্ষু সদাজাগ্রত।'

নীরা বলল, 'থাকতে দাও।'

দু'জনে বেরিয়ে গেল। খেতে গেল চৌরঙ্গির একটি বিশিষ্ট হোটেল-রেস্তোরাঁয়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা ঘরের আধো অন্ধকার এক কোণে গিয়ে ওরা বসল।

নীরা বলল, 'একটু ড্রিংক করবে বিজিত?'

বিজিত বলল, 'অন্য কিছুতে অভ্যস্ত নই, একটু বীয়ার খেতে পারি।'

নীরা বলল, 'আমি সাত বছর বাদে আজ একটু জিন খাব।'

বেয়ারাকে অর্ডার দিতে, পানীয় এল। বিজিতের এক বোতল বীয়ারের সঙ্গে নীরা দু' পেগ জিন খেয়ে নিল। ওর চোখ একটু রক্তিম দেখাল, নিশ্বাসও একটু ঘন। বিজিতের ঘন সান্নিধ্যে বসে খাবার খেল। বলল, 'অনেকদিন মুভিতে যাইনি।'

বিজিত বলল, 'যাবে?'

'না, তার চেয়ে চল কোথাও ঘুরে আসি, কলকাতার বাইরে কোথাও।'

'রূপনারায়ণ?'

নীরা একটু ভেবে বলল, 'না, অন্য কোথাও। চল, গঙ্গার মোহানায় যাই।'

দু'জনে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল। নীরা বুঝতে পারছে চারদিকে সকলের মনে নানান্ প্রশ্ন জাগছে। মনে মনে বলে, ভাবুক। নীরা আর ওসব ভাবতে চায় না। ও ক্রমাগত যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

বুকের টিউমারটিকে দাবিয়ে রাখা যায় নি, ক্রমেই যেন আকারে একটু বড় হচ্ছে, ব্যথা বাড়ছে। ইতিমধ্যে কয়েকবার রেডিওথেরাপিও হয়েছে। ব্যথা বাড়ছে। তথাপি বিজিতকে এখনো কিছু বলেনি। এখন দিন ছেড়ে বিজিতের সঙ্গে রাত্রেও বেরিয়ে যায়। গান শুনতে যায়, নাচ দেখতে যায়। ক্যাবারের আসরে নিজেও বিজিতের সঙ্গে নাচে। অনেকবার মনে হয়েছে, বিজিতকে না বলাটা ঠিক হচ্ছে না। আবার মনে হয়েছে, বিজিতকে বললেই, সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। আর তো কয়েকটা মাস। নীরা এখন মনে মনে স্থির বুঝেছে, হাসপাতালের ডাক্তারের কথা অক্ষরে অক্ষরেই সত্যি হতে চলেছে।

চার মাস পার হয়ে যাবার পরে নীরা একদিন বলল, বিজিত, আমাদের বিয়েতে বাধা কি?'

বিজিত বলল, 'কিছু না, কিন্তু তোমার শরীরটা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। আগে একটু ভাল হও, তারপরে হবে।'

নীরা বলল, 'না, আর দেরি না বিজিত, তাড়াতাড়ি কর। আমাদের কোন অনুষ্ঠানের দরকার নেই, কারোকে জানানোর প্রয়োজন নেই, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে আসব। আমাদের বিয়ের সাক্ষী থাকবেন বোস কাকা, আর আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর ঘোষ। রাজী তো বিজিত?'

বিজিত রাজী হল। বিয়ের নোটিশ দেওয়া হল। রেজিস্ট্রির দু'দিন আগে বিজিতের চোখের দৃষ্টি একেবারে বদলে গেল। সকালবেলার নীরার বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। নীরার ঘরে নীরাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আগে বলনি কেন নীরা?'

নীরা বিজিতের মুখ দেখে বুঝতে পারল, সে খবর পেয়েছে। বলল, 'আগে জানলে কী হত বিজিত? তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে না?'

'নিশ্চয়ই করতাম, কিন্তু জানতে পারলাম না কেন? তোমাকে যে হারাতে হবে, একথা তো বুঝিনি।'

নীরা বলল, 'অনেক বার বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। কিন্তু তোমাকে কে বলেছে বিজিত?'

'ডক্টর ঘোষ।'

'ডক্টর ঘোষ?'

'হ্যাঁ। দিন দিন তোমার শরীর খারাপ হতে দেখে, আমি গিয়েছিলাম ডক্টর ঘোষের কাছে, তোমার সম্পর্কে বলতে। উনি ভেবেছিলেন আমি সব জানি। তাই প্রথমে অবাক হলেও পরে কিছু বলতে চান নি। কেবল বললেন, নীরার যদি কোন অসুখ করে, সে তোমাকে নিজেই বলবে। কিন্তু ডক্টর ঘোষের ভাব দেখে, কথা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হল, তখন ওঁকে আমি চেপে ধরলাম। অনেক বলবার পরে উনি বললেন, "আজ বাদে কাল তোমাদের বিয়ে। কিন্তু যে কোন কারণেই, এ বিয়ে থেকে কি তুমি নিরস্ত হতে পারো?" আমি অবাক হলেও, জোর দিয়ে বললাম, "কখনোই না। নীরাকে বিয়ে করা থেকে কিছুই আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।" তখন তিনি আমাকে সেই সর্বনাশের কথা বললেন।'

নীরা বলল, 'কিন্তু সেজন্য তোমাকে আমি বলতে চাই নি[illegible]। আমার জন্যে তুমি ভয়ে ব্যস্ততায় ছুটোছুটি করবে, সেটা চাই নি। আমার শেষ দিনের তো দেরি নেই। তুমি জানতেই পারবে।'

বিজিত নীরাকে বুকের মধ্যে আরো নিবিড় করে নিয়ে বলল, 'কিন্তু কেন আমায় আগে বললে না, তা হলে তোমাকে আমি য়ুরোপের কোথাও চিকিৎসা করতে নিয়ে যেতাম।'

নীরা বলল, 'ভুল বিজিত, নিয়তির নির্দেশ তাতে ঠেকানো যেত না।'

বিজিত বলল, 'এখনো আমি তাই চাই নীরা, আমি হাল ছাড়ব না।

'না না বিজিত, আমাকে নিয়ে টানা-পোড়েন কর না। তোমার

বুকের কাছে থেকে এমনি করে আমাকে যেতে দাও। য়ুরোপের মানুষও এই ব্যাধিতে মরে। এ দেশ ছেড়ে গেলেই, আমি বাঁচব না। শুধু আমার কপালে সিঁথিতে যেন সিঁদুর থাকে। মধুসূদন রায়ের কোন সাধই পূর্ণ হয়নি, তুমি একটা সাধ পূর্ণ কর, তার মেয়ে যেন সধবা হয়ে মরে।'

বিজিত রুদ্ধ গলায় বলল, 'চুপ কর নীরা, চুপ কর।'

নীরা বিজিতের বুক থেকে মুখ তুলল। বিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিজিত, তোমার চোখে জল।'

বিজিত তার ভেজা চোখ হাত দিয়ে মুছে বলল, 'কি নিয়ে থাকব নীরা।'

নীরা চুপি চুপি বলল, 'আমাকে নিয়ে। আমি থাকব বিজিত, তোমার কাছে কাছে থাকব, তুমি সব সময় আমাকে অনুভব করবে। আর কারোর কাছে আমার স্মৃতি থাকবে না।'

বিজিত বলল, 'বেশ, নীরা, তোমার স্মৃতিই থাকবে, কিন্তু তোমার এই বিশাল বিত্ত-বৈভব, এ সবের ভার আমি বইব না, বইতে পারব না। আমার অনুরোধ, এ সব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে যাবে।'

নীরা একটু ভেবে বলল, 'আমি জানি, তুমি নির্লোভ, তুমি কর্মী, কর্মে বিশ্বাসী। তাই হবে বিজিত, আমার সবকিছু কোন জনহিতকর কাজে দান করে যাব। কিন্তু আমি একটা কিছু করে যেতে চাই।'

'কী করতে চাও?'

'বিজিত, আমি মনে মনে নিতান্ত সাধারণ মেয়ের মত স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর করতে চেয়েছি। হল না। স্বামী পেলাম, বাকীদের পেলাম না। আমি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইস্কুল আর পার্ক করে যেতে চাই, তার নাম হবে মধুসূদন বিদ্যালয়। তুমি ব্যবস্থা কর, আমি পরে সব বলব।'

বিজিত বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

বিজিতের সঙ্গে নীরার বিয়ে হয়ে গেল। কোন উৎসব নয়, শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাড়িতে বসেই শপথ-পত্রে সই হল। ব্রজকিশোর এবং ডক্টর ঘোষ সাক্ষী রইলেন। নীরা নিজের হাতে সবাইকে মিষ্টি পরিবেশন করল। কণা ওর সঙ্গে। বিজিত প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন, কখন নীরা হঠাৎ পড়ে যাবে।

এই আসরেই নীরা ওর ইস্কুল আর পার্কের পরিকল্পনা সকলের কাছে ঘোষণা করল।

পরদিন থেকেই তার রূপায়নের কাজ শুরু হল। নীরা বিজিতকে একলা ছেড়ে দিল না। ও বিজিত, ব্রজকিশোর, সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাজে ব্যস্ত রইলো। ওকে নিরস্ত করা গেল না। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। নীরা বুঝতে পারছে প্রতি পলে পলে ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর বিজিত যেন সেই মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করে দিন রাত্রি কাজ করে চলেছে।

আট মাস পূর্ণ করেও নীরা বেঁচে আছে। মনের জোরে বেঁচে আছে। বাড়িতে ওকে শুইয়ে রাখা যায় না। কাজের মাঝখানে একটি আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়ে সব দেখছে। মাঝে মাঝে উসকো খুসকো চুল, মজুরের মত পোষাক নিয়ে বিজিত কাছে আসছে। নীরার চোখে আলো ফুটে ওঠে, অনাবিল অনির্বচনীয় একটি হাসি ওর মুখে।

নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে বসে নীরা স্বপ্নকে সার্থক হতে দেখছে। ও যেন মৃত্যুকেই তিলে তিলে জয় করছে। জীবনের হাসি ওর মুখে।